তুপা

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

Tupa by **M Mamun Hossain**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2020

Price : 120.00
US $ 05

ISBN 978 984 526 316 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার পিতা মো. ইউসুফ হোসেন
পরিবার— একসূত্রে গেঁথে রাখার নেপথ্য মহানায়ক

সারারাত বিড়ালের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছেন মনোয়ারা বেগম। তিনি ভেবেই বসে আছেন আজ কোনো একটি দুর্ঘটনা ঘটবে। আর সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে আছেন। এত বেলা হয়েছে, এখনো তিনি কোনো খাবার মুখে দেননি। নাস্তা খাওয়ার জন্য কয়েকবার ডাকাডাকি করেও তাকে নাস্তা করানো যায়নি। সবাই ভেবে বসেছে তিনি রাগ করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার এরকম নাস্তা ত্যাগ করার কারণ জানতে পেয়ে অনেকে হাসতে গিয়েও হাসল না, পাছে সত্যি সত্যি তিনি রাগ করে বসেন।

হাসানকে বাড়ি থেকে বের হতে দেখে তার মা মনোয়ারা বেগম রাতের বিড়ালের কান্নার শব্দের কথা জানালেন। এবং ভালো করে বলে দিলেন, সাবধানে থাকতে। হাসান কথাটা মোটেও কানে তোলেনি, তার মা খেয়াল করেননি। মাকে তার কিছু কঠিন কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। সে নিজেকে সামলাল। কী দরকার— এই ভেবে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে বের হলো।

রাস্তার পান-সিগারেটের দোকান থেকে দুটো বেনসন অ্যান্ড হ্যাজেজ নিয়ে একটি ধরাল। আরেকটি পকেটে রেখে ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে লাগল। দোকানদার সিগারেটের দাম বেশি রেখেছে। ঘোষণা দিয়ে এখনো দাম বাড়ানো হয়নি। কিন্তু বাড়তি টাকা নেওয়া শুরু হয়েছে। আগে থেকেই ধূমাখোরদের সইয়ে নিচ্ছে। নতুন আরেকটি বাজেট চলে এলো। হুঁ, বাজেট এলেই এমনটা হয়। সূর্যের তেজ খুব একটা বেশি না। কিন্তু তারপরও রাস্তার পিচ গলে ভ্যাপসা একটা গরম ভাব আছে। হাসান মনে মনে ঠিক করছে— কোথায় যাবে? এখন গেলে সজীবকে মেসে পাওয়া যাবে। সেখানে যেতে তার মন চাইছে না। তুপার কলেজে গেলে কেমন হয়? হঠাৎ যদি দেখতে পায় ওর কলেজের সামনে হাসান দাঁড়িয়ে আছে। দেখে বেশ অবাক হবে। বলবে, 'হাসান ভাই আপনি? আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। চলুন আমার সঙ্গে।'

এসব ভাবতে ভাবতে তুপার কলেজের সামনে এসে পড়েছে হাসান। মেয়েদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে তার কিছুটা লজ্জা লাগছে। মনে হচ্ছে

সবাই তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কলেজ ছুটি হয়েছে। একে একে সবাই বের হচ্ছে। তুপাও এখন বের হবে। শেষ মেয়েটি বের হওয়া পর্যন্ত হাসান ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তুপা বের হয়নি। তুপা কলেজে আসেনি। তুপা আজ কলেজে আসেনি। কেন আসেনি? কী হয়েছে? শরীর-টরীর খারাপ করেনি তো? নাকি ওর বাসায় গিয়ে হাসান উপস্থিত হবে। প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে হাসানের মাথায় জিলাপির প্যাঁচের মতো প্যাঁচাতে থাকল। প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে একেবারে গিট্টু লেগে যাচ্ছে। রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে ঢুকল হাসান। দোকানের সবাই কমবেশি তাকে চেনে। রীতিমতো এখানটায় আড্ডা দেয় হাসানরা। একটা ছেলেকে ডেকে হাসান বলল, খুব কড়া করে এক কাপ চা দিতে। চায়ের অর্ডার দিয়ে আবারও ব্যাপারগুলো তার মাথায় প্যাঁচাতে শুরু করল। কোনো একটা বিষয় নিয়ে হাসানের এমন হয়। বিশেষ করে তুপাকে নিয়ে বড্ড বেশি হয়। রাজ্যের নানান চিন্তা আসে। প্যাঁচাতে থাকে।

চা এলো। অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিতেই ঠোঁটে ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিজের ওপর হাসানের খুব রাগ হচ্ছে। আসলেই আজ দিনটা খারাপ। সকাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হলো না। চা খেতে গিয়ে ঠোঁট পুড়ল। চা শেষ করেই হাসান সজীবের মেসে গেল। সেখানেও সজীব নেই। তার রুমমেট রাকিব আছে।

'হাসান, কেমন আছো?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'আছি, তা অনেকদিন পরে আসলে।'

'আমি মাঝে মাঝেই আসি রাকিব ভাই। আপনার সঙ্গে টাইমিং মেলে না। দেখা হয় না। সজীব কখন আসবে কিছু জানেন?'

জুতা পরতে পরতে রাকিব বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। তবে আসতে আসতে সন্ধ্যা হবে। তুমি বরং থাকো। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।' হাসান একবার ভাবল বলবে, না আজ চলে যাই। কিন্তু কিছু বলল না। রাকিব চলে গেল। হাসান দরজা ভিড়িয়ে সজীবের নড়বড়ে চৌকিতে শুয়ে পড়ল।

সজীবের রুমে দুটি চৌকি পাতা। চৌকির হাল খুব বেশি ভালো না। নৌকার মতো কাঁপে। শোয়ার সময়ে বেশ কসরত করতে হয়। ঢাকায় এসে নয়াবাজার থেকে চৌকিটা কিনেছিল সজীব। ওর সঙ্গে হাসানও গিয়েছিল। তাঁতিবাজার মোড় থেকে নয়াবাজার যেতেই দোকানগুলো। ঢাকার অন্য এলাকায় কাঠের আসবাব বিক্রির অনেক দোকান আছে। কিন্তু চৌকি কিনতে নয়াবাজার যেতে হবে। মেসজীবনে এই চৌকির বেশ কদর। ঢাকায়

মেসে যারা থাকেন তারাই এই চৌকির বড়ো কাস্টমার। চৌকি আর খাটের মধ্যে বড়ো পার্থক্য আছে। চৌকি হচ্ছে চার বা ছয় পায়ে দাঁড়ানো নকশাবিহীন সমান্তরাল কাঠের তৈরি। দামও কম।

একটা চৌকিতে রাকিব আর অন্যটায় সজীব থাকে। ঘরে একটা আলনা আছে। মাথার ওপর একটা সিলিংফ্যান। তবে ফ্যানটায় বাতাসের চেয়ে শব্দ হয় বেশি। সজীবের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়। তিন ভাইবোনের মধ্যে সজীব সবার বড়ো। সজীব গ্রাম থেকে এসএসসি পাশ করেছে। বাবা গ্রামের দরিদ্র মানুষ। কিছু জমিজমা চাষাবাদ করে। অর্থোপার্জনের মাধ্যম জমি। হাইস্কুলের পড়াশেষে কলেজে ভর্তি করাতে তেমন আগ্রহ সজীবের বাবা লাল মিয়াঁর ছিল না। কিন্তু ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছে আর স্কুলের শিক্ষকদের পীড়াপীড়িতে কলেজে ভর্তি করাতে রাজি হন। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব তার ঢাকার একজন আত্মীয়ের বাড়িতে সজীবের লজিং থাকার ব্যবস্থা করে দেন। গ্রামের সবার সঙ্গে বিদায় নিয়ে সজীব চলে আসে ঢাকায়, ভর্তি হয় ঢাকা কলেজে। কলেজেই হাসানের সাথে পরিচয়। তারপর বন্ধুত্ব। এভাবে কলেজজীবন পেরিয়ে একসাথে বিশ্ববিদ্যালয় পার করেছে। বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ছাড়া একটুও কমেনি।

সজীব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে হাসান ঘুমাচ্ছে। বিছানার সামনে বসে বেশ কয়েকবার ডাকে, 'হাসান! হাসান! এই হাসান!' অনেকক্ষণ পর হাসান চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'সজীব কখন এলি?'

'এই তো এক্ষুনি!'

'কটা বাজে?'

'সাতটা।'

ফিরোজ সাহেবের মা রোকেয়া বেগম জানতে পারলেন তার স্বামী মাহতাব আহমেদ দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। সেই ঘরে দুই মেয়ে এক ছেলে হয়েছে। ফিরোজ সাহেব তার বাবার হঠাৎ এমন হতবুদ্ধিতে অবাক হলেন। কিন্তু কোনোকিছু বললেন না। মাহতাব আহমেদের পাঁচ মেয়ে এক ছেলে। সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ের ঘরে তার নাতি-নাতনি আছে। আর এই বয়সে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে। এই ঘটনা কেউ মেলাতে পারলেন না। এ নিয়ে রোকেয়া বেগম সারাক্ষণ বিলাপ করে কাঁদেন। দিনরাতের বেশিরভাগ সময়েই এ নিয়ে অশান্তি শুরু হলো। রোকেয়া বেগম কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, বুড়ার এই বয়সে কী ভিমরতিতে ধরল— এই ফিরোজ তোর বাপের এ কী হলো? রোকেয়া বেগম তার স্বামীর ভাগ সতিনকে দেওয়ার ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারলেন না। তিনি বেশিদিন টিকলেন না। মারা গেলেন। সবাই তার মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবেই নিল। রোকেয়া বেগম প্রচণ্ড মানসিক যাতনায় চলে গেলেন। শরীরের অসুখের চেয়ে মনের অসুখ বড়ো। মনের অসুখের কোনো ওষুধ নেই। জ্বর, সর্দিকাশি, ক্যানসারের ওষুধ আছে। নিরাময় আছে। মনের অসুখের নিরাময় নেই।

স্ত্রীবিয়োগের পরপর মাহতাব আহমেদও ভেঙে পড়লেন। তার দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে অনুতাপ করতে লাগলেন। একদিন বড়ো ছেলে ফিরোজকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাপ-ছেলের মধ্যে কী নিয়ে আলোচনা হলো তা তারা দুজনেই জানেন। এ পৃথিবীর মায়া মাহতাব আহমেদকে ধরে রাখতে পারল না। ছমাসের ব্যবধানে বাবা-মা দুজনকে হারালেন ফিরোজ সাহেব। তারপর ফিরোজ সাহেব তার সৎমা মনোয়ারা বেগমকে এই বাড়িতে নিয়ে আসেন। বসালেন মায়ের আসনে। হাসান ফিরোজের সৎভাই। হাসানকে কোলেপিঠে করে ফিরোজ সাহেবই বড়ো করেছেন। তারা সৎভাই বাইরে থেকে কারো বোঝার সাধ্য নেই। হাসানের গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু তার বড়ো ভাই ফিরোজ তাকে কাল্লু নামে ডাকে। অন্য কেউ এ নামে তাকে ডাকে না। নামটা হাসানের পছন্দ না। এটা একটা ডাকার নাম

হলো। কিন্তু ফিরোজ সাহেব এই নামেই তাকে ডাকে। এই নামে ডাকার পেছনে এক ঘটনা আছে। হাসান যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে তখনকার একটি ঘটনা। ব্যাবসার কাজে ফিরোজ সাহেব রাজশাহী গিয়েছিলেন। তখন আমের মৌসুম। সঙ্গে করে আম নিয়ে এসেছেন। হাসান স্কুল থেকে ফিরেই আম খেয়েছে। বিকেলে হঠাৎ করে হাসানের বমি শুরু হলো। বমির সঙ্গে রক্ত। হাসপাতালে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করা হলো। এক সপ্তাহেও বমি কমে না। বমির সঙ্গে রক্ত পড়ে। কঠিন অসুখ। ডাক্তারও রোগ ধরতে পারছে না। ফিরোজ সাহেব পাগলের মতো হয়ে পড়লেন। কেউ একজন তাকে বিক্রমপুরে সিংপাড়া এলাকার এক ফকিরের বাড়িতে যেতে বললেন। সেদিনই তিনি ওই ফকিরের বাড়িতে গেলেন। ফকির কিছু কেরামতি দেখালেন। তাকে ফজরের নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে জীবন ভিক্ষা চাইতে বললেন। ওই ফকিরের পরামর্শে ফিরোজ সাহেব হাসানকে কাল্লু নামে ডাকে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে হাসানের দেখা হয় না। তার আগেই ফিরোজ সাহেব ব্যাবসার কাজে বের হয়ে যান। ভাদ্রমাসের পাঁচ তারিখ তার বাবা মাহতাব আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকী। ফিরোজ সাহেব বাসা থেকে বের হওয়ার আগেই বলে গেছেন। কাল্লু যেন জয়নাল সাহেবের বাসায় গিয়ে দাওয়াত দিয়ে আসে। এই জয়নাল সাহেব আজিব এক মানুষ। সারাদিন বাসায় থাকেন। রাতের বেলা তার কাজ। তার সব কাজ রাতে হলেও লোক দু-নম্বরি না। দারুণ রসিক মানুষ। হাসানকে পছন্দ করেন। হাসান সকাল দশটার দিকে জয়নাল সাহেবের বাসায় পৌঁছে গেল। বগলের কাছ অবধি গোটানো নীল রঙের ফুলহাতা শার্ট আর কালো জিনসের প্যান্ট পরেছে হাসান। বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। এ বাসায় এসে কলিংবেল বাজায় না। একবার সুইস চাপতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়েছিল। এরপর বহুবার তাকে বলা হয়েছে সুইচ ঠিক করা হয়েছে। হাসান সে কথায় বিশ্বাস না করেই জোরে জোরে দরজা পেটাতে থাকে।

দরজা খুলল কাজের মেয়ে ফুলিমন। গ্রামের মেয়ে। খুব আদবকায়দাওয়ালা। দরজা খুলেই সঙ্গে সঙ্গে সালাম দেয়। প্রমিত উচ্চারণে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে। রীতিমতো টাসকি লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। হাসান বলল, 'ফুলিমন কেমন আছো?'

'জি ভালো।'

'কাকা বাসায় আছেন।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ফুলিমন হাসানকে ড্রয়িংরুমে বসাল। এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে অদিতি। দেখতে সুন্দর। মুখের অবয়ব, ভাসা চোখ।

ফিগার অতুলনীয়। সে কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বিবিএ-তে পড়ছে। সুন্দরীরা সব বিবিএ পড়ছে। হাল আমলে সবকিছু বাদ দিয়ে বিবিএ পড়া ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। আগেপিছে কী করবে ঠিক নেই; পড়তে হবে বিবিএ। মা-বাবারা সব হাসিহাসি মুখ করে বলেন, আমার ছেলে বিবিএ পড়ছে বুঝলেন। বিরাট এক ফ্যাশন।

হাসানকে দেখে অদিতি ড্রয়িংরুমে ঢুকল। তার মুখে আনন্দের ছটা। দেখে মনে হয়, সে জানত আজ হাসান আসবে।

'হাসান ভাই, কেমন আছো?'

'ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?'

'কেমন আছি তা জানার তোমার টাইম আছে? আজ কতদিন পরে এসেছ জানো?'

হাসান ঠিক কতদিন পর এলো তার মনে নেই। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না। মনে করতে পারল না। হিসাবনিকাশ করতে গেলে মাথায় আবার প্যাঁচাতে শুরু করবে। তাই ঠোঁট টেনে অদিতির দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল।

'বলতে পারছ না তো? জানতাম, পারবে না। আচ্ছা, তুমি এমন কেন বলো তো?'

'তুমি তো যেতে পারো।'

'আমি তো যাই-ই। কিন্তু যার জন্য যাই। যাক, সেসব কথা। তা হঠাৎ কী মনে করে এলে? না ভুল করে চলে এসেছ।'

'এমনি। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'ভার্সিটি!'

'যাও তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হচ্ছে। তবে আজ আর যাব না।'

হাসান বলতে চেয়েছিল কেন যাবে না? কিন্তু বলতে গিয়েই থেমে গেল। কারণটা হাসান জানে। অদিতি হাসানকে পছন্দ করে। ইনিয়েবিনিয়ে অনেকবার তা বোঝানোর চেষ্টা করেছে। হাসান সবই বোঝে। অদিতি সুন্দরী। ভরাট শরীর। উপচে পড়া যৌবন। যে-কোনো যুবকের হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ করার মতো শারীরিক গঠন। কিন্তু হাসানের ভালো লাগে না। পিরিতের পেতনিও সুন্দর। যখনি অদিতিকে দেখে তার মনে তৃষ্ণা জাগে। সেই তৃষ্ণা নগ্নতার। তাকে নিয়ে কয়েকবার রাজ্যের সব বাজে বাজে চিন্তা এসেছে। একবার তো অদিতিকে নিয়ে রাতে স্বপ্নই দেখে ফেলেছে হাসান। কীসব হিজিবিজি। অবশ্য সেসব অনেকদিন আগের কথা। সকালে ঘুম থেকে উঠে তো ভেবেছিল বিছানায় হিসু করে দিয়েছে। কী হলো, কী হলো ভাবতে

ভাবতেই গেল সারাদিন। লজ্জায় কাউকে বলতে তো পারছে না। কী করবে? কলেজে যাওয়ার সময় ফুলবাড়িয়ায় সুন্দরবন স্কয়ার মার্কেটের সামনে একজন কীসব ছবি দেখিয়ে ওষুধ বিক্রি করছিল। লোকজন সবাই গোল করে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রেতার হাতে থাকা একটি অ্যালবাম থেকে একের পর এক ছবি দেখিয়ে বর্ণনা দিচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেসব শুনতে থাকে হাসান। খুব ভয় পাচ্ছিল। এখনো কানে বাজে 'আগা চিকন, গোড়া মোটা। পূর্ণ সুখ দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ঘনঘন স্বপ্নদোষ।' সবকিছু মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। একটি শব্দ তার মগজে ঢুকে গিয়েছিল স্বপ্নদোষ। এটা আবার কী? স্বপ্ন তো স্বপ্নই। রাতে স্বপ্ন দেখলে এতে দোষের কী? এ নিয়ে একা একা গবেষণা করেও কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। এক সময় কলেজের বন্ধুদের কাছ থেকেই জানা হলো। এমন কত ঘটনা সেই কিশোর বয়সের। এগুলো ভেবে হাসানের নিজেরই লজ্জা লাগে। ছি এসব কী ভাবছে? জয়নাল সাহেবকে ঢুকতে দেখে হাসানের ভাবনায় ছেদ পড়ল। হাত উঁচিয়ে সালাম দিলো হাসান, আসসালামু আলাইকুম।

সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, 'হাসান কেমন আছো?'

'জি ভালো।'

'বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'জি আছে।'

'তুমি তো এখন আসোই না?'

'আসব আসব করে আসা হয় না।'

'ঠিক বলেছ। আরবের মানুষ হজ পায় না। হি... হি... হি। কিন্তু তুমি যদি বিদেশেও থাকতে এই কদিনে অন্তত তোমার একটি চিঠি হলেও পেতাম। কী বলো, ঠিক বলেছি কি না?'

হাসান মাথা নাড়ে। বেশ জোরে নাড়ে।

'অনেকদিন পরে এলে। আজ একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাব। তোমার সঙ্গে দাবা খেলতে বসব। মনে আছে, গতবার তুমি আমায় হারিয়েছ।'

'আজ খেললেও হারবেন।'

'না আজ জিতব। তুমি দেখে নিয়ো।'

'তাহলে চলুন খেলা শুরু করি।'

'ঠিক আছে। তুমি জিতলে তোমাদের সবাইকে চাইনিজ খাওয়াব।' এমন সময় অদিতি নাস্তা নিয়ে রুমে ঢুকল। অদিতির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী বলিস মা, তোর হাসান ভাই, যদি হারে তাহলে কী হবে?'

জয়নাল সাহেব দাবার কোট সাজাতে বসলেন। অদিতি তার বাবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'আব্বু আগে হাসান ভাইকে নাস্তা করতে দাও।

তারপর তোমাদের দাবা।' জয়নাল সাহেব 'জো আজ্ঞা' বলেই হিহি করে হাসতে লাগলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'মা, শোন হাসানের সাথে বাজি চলছে। যদি ও জেতে তাহলে তোদের সবাইকে চাইনিজ খাওয়াব। তোর মাকে ডাক আগে। তাড়াতাড়ি ডাক, আজ আমি জিতবই।'

'আব্বু আমি কিন্তু হাসান ভাইয়ের দলে।'

মেয়ে বলে কী? হাসান শুনেছ। বাপের পক্ষ না নিয়ে তোমার পক্ষ নিচ্ছে। তোমাকে কিন্তু ও পছন্দ করে, বলেই জয়নাল সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন।

অদিতি এই কথা শুনে লজ্জা পেয়ে আর খেলা পর্যন্ত হাসানের সামনেই আসেনি। জয়নাল সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম বেগম স্বামীর কথামতো বসে বসে দাবাখেলা দেখছেন। আসলে মরিয়ম বেগম দাবাখেলার কিছুই বোঝেন না। চুপচাপ বসে দাবার কোটে তাকিয়ে আছেন। কোনো গুটি খাওয়া পড়লেই চোখদুটো তার বড়ো বড়ো হয়ে যাচ্ছে। একবার জয়নাল সাহেবের দিকে তাকান। আর একবার হাসানের দিকে তাকান। আজ অদিতি রান্না করছে।

দুপুরের সময় খেলা শেষ হলো। হাসান আজও জিতেছে। জয়নাল সাহেব আজ হেরেছেন। তারপরও তিনি খুব খুশি। জোহরের নামাজ শেষ করে হাসানকে নিয়ে জয়নাল সাহেব খেতে বসলেন। অদিতি সবার সাথে খেতে বসল না। অদিতি নিজেই বেড়ে বেড়ে খাওয়াল আজ।

সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব এমন সময় হাসান জয়নাল সাহেবের বাসা থেকে বের হলো। অদিতি আজ হাসানকে তাদের ছাদে নিয়ে গেছে। ছাদের পুরোটাই গোলাপ টবে ভরতি। গাছে গোলাপ ফুটে চেয়ে আছে। দেখতে অনেক ভালো লাগে। হাসানের চোখে চোখ রেখে অদিতি বলল, 'হাসান ভাই, আমি তোমাকে ভালোবাসার ওপরে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে...।' কথাটা শেষ করতে পারেনি মেয়েটি। তার দু-চোখ ছলছল করে ওঠে।

প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। এই রোদে হাঁটতে কষ্ট হয়। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। সজীবের একটা ইন্টারভিউ আছে। চাকরিটা তার হবে না, সে একশোতে একশো দশ ভাগ নিশ্চিত। নিয়োগকর্তাদের প্রশ্নগুলো ছিল বেশ অদ্ভুত। তারা এমন প্রশ্ন করে দারুণ মজা পায়। খুব মজা। অদ্ভুত সব প্রশ্ন করবেন। চাকুরিপ্রার্থীর অসহায় চেহারা দেখে তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন। মনে মনে গালি দেবেন, আস্ত একটা গবেট। এরা সব গবেটের দল।

'আপনার নাম তো খন্দকার আনিসুর রহমান?'

'জি।'

'আচ্ছা বলুন তো এটা কী মাস চলছে?

'বাংলা মাস বলব, না ইংরেজি মাস।'

'বাংলা মাসই বলুন। আমরা তো বাঙালি হয়েও বাংলা মাস জানি না। আরেকজন সুর মিলিয়ে বললেন, বাংলাই বলুন।

'ভাদ্রমাস।'

'এ মাসের আপনার একটি প্রিয় কিছুর নাম বলুন তো?'

'তালের পিঠা।'

'আপনার সব রেজাল্টই ভালো। ঠিক আছে আমরা পরে জানাব।'

সজীব জানে এই পর আর আসবে না। কখনো তাকে জানানো হবে না। আর তার চাকরিও হবে না। সে ভেবে পায় না, তাদের এসব প্রশ্নের সাথে চাকরির কী সম্পর্ক। একটার পর একটা চাকরির দরখাস্ত করেই যাচ্ছে। একটার পর একটা ইন্টারভিউ। যদি মিলে যায়। আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের চেরাগ নেই তার। ঘষা দিলে বেরিয়ে আসত মস্ত বড়ো এক জিন। আর জো আজ্ঞা বলে জিজ্ঞাসা করত কী চাই আপনার?

সজীব দুপুরে মেসে ফিরল না। ফুটপাতের পাশে হোটেল ছালাদিয়া থেকেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। ভাত, ডাল আর পাঙ্গাস মাছের দোপেঁয়াজা। রান্না খারাপ না। হাসান এসব হোটেলের নাম দিয়েছে দা গ্রেট ইটালিয়ানা রেস্টুরেন্ট। আর ছালাদিয়া হোটেল মানে হচ্ছে চারদিকে পাটের

বস্তা দিয়ে ঢাকা ভাতের হোটেল। ঢাকার বিভিন্ন এলাকাতেই কমবেশি এসব হোটেল আছে। কর্মজীবী এলাকাগুলোতে এই হোটেলের বেশ কদর। গুলশানের মতো অভিজাত এলাকাতেও এই হোটেল আছে। গুলশান এক নম্বর গোল চত্বরের ঠিক আগে ডিসিসি মার্কেটের গলিতে ছালাদিয়া হোটেলে হাসানের সঙ্গে অনেকবার খেয়েছে সজীব। তবে ছালাদিয়া হোটেলের মধ্যে তিব্বতের গলি, বেগুনবাড়ি, ফুলবাড়িয়া, ওয়াইজঘাটের বেশ কিছু হোটেলের খাবার ভালো। তৃপ্তি নিয়ে ভরপেট খাওয়া যায়। দাম খুব বেশি না। এখন আবার কিছু কিছু হোটেলে চিকন চাউলের ভাতের ব্যবস্থা করেছে। ঢাকায় এসে সজীব জীবনে প্রথম চিকন চালের ভাত দেখেছে। এর আগে চিকন চালের ভাত চোখেও দেখেনি। হাসানের বাসায় প্রথম চিকন চালের ভাত খেয়েছে। কী সুন্দর ঘ্রাণ। কত কত খাবারের আইটেম। গোরুর মাংস, খাসির মাংস, মুরগির মাংস। একসঙ্গে কত পদ দিয়ে ভাত খাওয়া। গ্রামে একপদ দিয়েই ভাত খেয়ে নিত সজীব। ওদের বাজারে সব সময় মাংস কিনতে পাওয়া যায় না। প্রতি মঙ্গলবার হাটবার। মাসে চারদিন হাট বসতো। মাসের প্রথম মঙ্গলবার আর তৃতীয় মঙ্গলবার হাটে মাংস বিক্রি হতো। এর আগে মাইকিং করত বিরাট এক গোরু এই হাটবারে জবাই করা হবে। আগ্রহী ক্রেতারা অগ্রিম নাম লিখে আসত। কার কত কেজি গোরুর গোশত লাগবে। ঢাকায় বড়ো বড়ো গোরু-খাসির গোশতের দোকান আছে। পুরো সপ্তাহেই গোরুর গোশত কেনা যায়। হাসান আমাকে নিয়ে গোরুর গোশত কিনতে যেত গোয়ালঘাট বাদশাহ মিয়াঁর দোকানে। গোরুর গোশত কেনার জন্য বিরাট লাইন। বাদশাহ মিয়াঁর ছেলে এমদাদ এই দোকানের মালিক। তার বাবাও কসাই ছিলেন। সারা ঢাকাতেই এই গোরুর গোশতের দোকানের নামডাক। হাসান গোশত কিনতে গেলে এমদাদ ভাই দোকানের ভেতর ডেকে নিতেন। আমাকে আর হাসানকে ক্যাশে বসাতেন। পাশের ফারুক বেকারি থেকে বাটারবান এনে খাওয়াত। অনেক বছর হাসানের সঙ্গে আর গোশত কিনতে যাওয়া হয়নি সজীবের।

পাঁচটা থেকে সজীবের টানা টিউশনি। রাত ন-টা পর্যন্ত টিউশনি চলবে। এই টাকা দিয়ে নিজের ঢাকায় থাকার খরচ। এই থেকে আবার গ্রামেও পাঠাতে হয় তাকে। গতকাল একটি চিঠি এসেছে গ্রাম থেকে। চিঠিটা তার বাবা লিখেছেন।

বাবা সজীব,

পত্রে দোয়া রইল। আমরা এখানে কুশলেই আছি। অনেকদিন তোমার কোনো চিঠিপত্র পাই না, তাই চিন্তায় আছি। তোমার মা গতরাতে খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। তাই তোমায় চিঠি লিখতে হলো। তুমি কেমন

আছো জানাইবা। সেই যে পরীক্ষাশেষে সপ্তাহখানেক এসে থেকে গেলা, আজ কয়মাস হলো তুমি বাড়িতে আসো না। সবই বুঝি। তারপরও বাপ-মায়ের মন তো মানে না। তোমার শরীরের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিয়ো। তোমার ভাইবোনের সালাম নিয়ো। তোমার মায়ের দোয়া রইল। আর কী লিখব। পত্রপাঠ উত্তর দিয়ো।

ইতি

তোমার বাবা

লাল মিয়াঁ

চিঠিটা এখনো সজীবের পকেটে। চিঠির উত্তরের সাথে তাকে মানিঅর্ডার করে কিছু টাকা পাঠাতে হবে। বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছে ঘরের চাল ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে ঘরে পানি পড়ে। এখনো মাস শেষ হয়নি। তারপরও তাকে কিছু টাকা জোগাড় করতেই হবে।

এখন সজীবের হাঁটতে খারাপ লাগছে না। রোদ পড়ে গেছে। অদ্ভুত শহর। সবাই ব্যস্ত। কারো সময় নেই। মনের কথা বলে কিছুটা হালকা হওয়ার উপায় এই শহরে নেই। সজীব, মীম নামের একটি মেয়েকে পড়ায়। দারুণ বুদ্ধিমতী। ফাইভে পড়া একটি মেয়ে কিন্তু কী অসম্ভব তার বুদ্ধি! সজীব আশ্চর্য হয়। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মীম সজীবের সঙ্গে গল্প করে। সংসারের এতসব ঝামেলায় মীমের সঙ্গে টুকটাক গল্প করতে তার ভালোই লাগে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

‘মীম, তোমার পড়া সব মুখস্থ হয়েছে?’

‘হয়েছে।’

‘আর কিছু বাকি আছে?’

‘উঁহুঁ। স্যার বলুন তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বোকা কারা?

‘বলতে পারছি না।’

‘মানুষরা।’

‘মানুষরা?’

‘মানুষরাই সবচেয়ে বোকা।’

‘তুমি কী করে বুঝলে।’

‘বলব না।’

‘কেন?’

‘এমনি। আপনি রাগ করেছেন?’

‘না। কেন বলো তো?’

‘আমি বলব না বলে।’

‘না রাগ করিনি। আমি তোমার ওপর কখনো রাগ করি না।’

মীমের কথা আসলেই সত্য। পৃথিবীর সব প্রাণীর চেয়ে মানুষই সবচেয়ে বোকা। তারা সংসার বাঁধে। ভালোবাসে। আশায় বুক বাঁধে। তারপর সব একদিন শেষ হয়ে যায়। জোলাবাত্তি খেলার মতো সব শেষ হয়ে যায়। আশা নিরাশায় রূপ নেয়। কেউ পরের খোঁজে ঘর ছেড়ে যায়।

ফিরোজ সাহেব বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছেন। পাশে তার স্ত্রী জোলেখা বেগম ঘুমিয়ে আছেন। ফিরোজ সাহেবের কালো চুল তুলছে তার নাতনি ইমা। তার বড়ো ছেলে লিমনের মেয়ে। খুব আগ্রহের সাথে চুল তুলছে ইমা। প্রতি চুল পাঁচ টাকা। ফিরোজ সাহেবের মাথাভরতি সাদা চুল। তার এ বয়সে এমনভাবে চুল কারো পাক ধরে না। কিন্তু তার বেলাতে মাথাভরতি চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। সকালে এসে ইমা বলল—

'দাদু তোমার পাকা চুল তুলে দিই?'

'দাও। তবে পাকা চুল তুলতে গেলে তো মাথায় একটি চুলও থাকবে না। দাদু তুমি বরং আমার কালো চুল বেছে বের করো। তখন থেকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ইমা কালো চুল তুলছে।

ফিরোজ সাহেব যে বাড়িটায় থাকেন এটি তার পৈতৃক বাড়ি। তার বাবা কিনেছিলেন। পুরাতন নকশায় দোতলা বাড়িটা এখন বেমানান। এর আশেপাশে এত বড়ো জায়গাজুড়ে এ ধরনের একটিও বাড়ি নেই। সবাই আর্কিটেকচার দিয়ে নকশা করে বহুতল দালান তুলছেন। দু-একটি যা বাকি আছে তারা অ্যাপার্টমেন্ট কোম্পানির সাথে চুক্তিতে হাই রাইজ বিল্ডিং করছে। ফ্ল্যাট ব্যাবসা মন্দ নয়। একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে ঢাকায় ছোটো পরিবার বাড়ছে। তারা এখন ফ্ল্যাট কেনার দিকে ঝুঁকছে। দুই বেডরুম, এক ড্রয়িং-ডাইনিং রুম, দুই বাথরুমের ফ্ল্যাটের চাহিদা খুব। দামও চড়া। এই টাকায় জুরাইনে তিন কাঠা জমি কেনা যায়। একটু ভেতরের দিকে গেলে জমির দাম এখনো কিছুটা কম। এই শনিরআখড়া কিংবা মাতুয়াইলে। ঐ এলাকাটা পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান ইরি ধান আবাদের জন্য করেছিলেন। বাঁধ দিয়েছিলেন। ডিঅ্যান্ডডি বাঁধ। ভাতের পাগল বাঙালির সারা বছর চাউলের জোগান দিতেই এলাকাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐ এলাকায় এখন আর কোনো খেত নেই। দেশের জনসংখ্যার আবাদ এত বেশি যে, সেখানে জমি কেনার হিড়িক পড়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে 'নিষ্কন্টক জমি বিক্রি হবে'। ফিরোজ সাহেব

ভেবেছেন ঐ এলাকায় কিছু জমি কিনে রাখবেন। পাঁচ বছর পরেই মাটির দাম স্বর্ণের দাম হয়ে যাবে।

ফিরোজ সাহেব অনেকদিন ধরেই ভাবছেন বাড়ির কাজও ধরবেন। কিন্তু তা করা হয়ে উঠছে না। দক্ষিণের দিকে ঘরটায় ফিরোজ সাহেব থাকেন। এই ঘরটায় তার দাদা-দাদি থাকতেন। ঘরটায় তার দাদার আমলের আসবাবেই একেবারে ঠাসা। কাঠের সব আসবাবপত্র। এগুলো বেশ পুরোনো হয়ে গেছে। মায়ার টানে ফিরোজ সাহেব বদলাতে পারেন না। ফিরোজ সাহেবের এই বয়সেই রোগে পেয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই ডাক্তাদের কাছে দৌড়াতে হয়। তার বাবা মাহতাব আহমেদের রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তা না হলে কি কেউ ওই বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ ঘরে আনে?

ইমা বলল, 'দাদু কত টাকা হয়েছে?'

'অনে...ক।'

'বলো না কত হয়েছে?'

'তুমি হিসাব করো দেখি।'

'জি আচ্ছা।'

ইমা একটি একটি করে চুল গুনে হিসাব করছে কত টাকা হয়েছে।

ফিরোজ সাহেব বললেন, 'কত টাকা হয়েছে দাদু?'

'পঞ্চাশ টাকা।'

'পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে। তাহলে তো এখনো অনেক কালো চুল আছে।' বলেই হাসতে শুরু করলেন।

'তুমি যে সকালে উঠে এখনো পড়তে বসোনি আম্মু বকবে না?'

'না বকবে না। আজ তো শুক্রবার।

'ও তাইতো; আজ তো ছুটির দিন। তোমার আব্বু-আম্মু কী করছে?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'দিদা, গুড মর্নিং।'

জোলেখা বেগম ঘুম থেকে উঠেছেন। তিনি ইমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসিটা গুডমর্নিঙের উত্তর। ফিরোজ সাহেব বললেন, 'অনেক বেলা হলো। এখনো তো চা এলো না।'

'আমি উঠে আনছি।'

'তুমি আনবে কেন?

'কাজের মেয়েটা এখনো আসেনি মনে হয়। তাছাড়া আজ শুক্রবার বউমা মনে হয় ঘুম থেকে ওঠেনি।'

জোলেখা বেগম বিছানা থেকে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরোজ সাহেবের বড়ো ছেলের বউ রিনা চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল।

'আব্বা আপনার চা।'

'দাও।'

'আব্বা চায়ের চিনি ঠিক আছে?'

'হুঁ।'

'ইমা আসো, দাদুকে বিরক্ত কোরো না।'

'থাক, বউমা। ইমা আমার কাছেই থাক। তুমি বরং দেখো— হাসান আর ইমন ঘুম থেকে উঠেছে কি না?'

'জি আচ্ছা।'

রিনা আজ সকালে উঠেই গোসল করেছে। নীল রঙের ছোপ ছোপ একটা সুন্দর শাড়ি পরেছে। এমনিতেই রিনা সুন্দর তাকে আরও সুন্দর লাগছে। যে-কারো কাছেই তার ঠোঁটের কোণের হাসিটা চোখে পড়বে।

হাসানের ঘরে যাওয়ার সময় তার দাদিশাশুড়ি মনোয়ারা বেগম রিনাকে ডাকলেন, 'নাতবউ— শুনে যা তো।'

রিনা ঘরে ডুকল। মনোয়ারা বেগম কোরআন শরিফ পড়ছিলেন। তিনি কোরআন পড়া বন্ধ করে রাখলেন। মনোয়ারা বেগম বললেন, 'বস। কোথায় যাচ্ছিলি— হাসানের ঘরে?'

'জি...।'

'নাতবউ তোর কয়মাস চলছে?'

'জি দাদি।'

'বলছি, তোর কয়মাস চলছে।'

রিনা খুব লজ্জা পেল। তার মনে হচ্ছে সে কোনো বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে বাঘের মুখের সামনে এসে থেমেছে। রিনা যে আবার অন্তঃসত্ত্বা, বাচ্চা হবে। তা গতকালই প্রথমে বুঝতে পেরেছে। হঠাৎ করে কীভাবে দাদিশাশুড়ি বুঝে ফেললেন? তার স্বামী এখনো জানে না। আগের দিনের মানুষেরা আগেভাগেই অনেক কিছু বলে দিতে পারেন!

মনোয়ারা বেগম বললেন, 'তোর শাশুড়ি জানে?'

'জি না।'

'শোন নাতবউ। এখন থেকে বাছবিচার করে থাকবি। বাইমমাছ, মৃগামাছ খাইবি না।'

'আচ্ছা।'

'মৃগামাছ খেলে বাচ্চার মৃগীরোগ হয়। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। তোরা আজকালকের পোলাপান এগুলো আবার মানতে চায় না। উড়াইয়া দেয়।' রিনা দাদিশাশুড়ির পা ছুঁয়ে সালাম করল। রিনা যেন পালাতে পারলেই বাঁচে এমনভাবে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। এই দাদিশাশুড়িকে সে অসম্ভব ভয় পায়। তারপরও মনোয়ারা বেগমকে

তার ভালো লাগে। আগের দিনের মানুষ। মাঝেমধ্যে রিনাকে ডেকে তিনি নানান গল্প করেন। রিনা সেসব গল্প খুব মন দিয়ে শোনে। হাসানের ঘরের সামনে এসে রিনা দেখল, হাসান দাঁত ব্রাশ করছে আর ইমন ঘুমাচ্ছে। ইমন ফিরোজ সাহেবের ছোটো ছেলে। রিনার দেবর।

রিনা বলল, 'ছোটো বাবা আপনাকে আব্বা ডাকছে।'

'মুখ ধুয়ে আসছি।'

'আপনার জন্য চা আনব?'

'না থাক।'

'ছোটো ভাই কি ঘুমাচ্ছে? আব্বা তাকেও ডাকছেন।'

'আমি ইমনকে নিয়ে আসছি।'

'জি আচ্ছা।'

চাচাশ্বশুর হাসানকে ছোটো বাবা ডাকে রিনা। তাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। রিনার কাছে হাসান যেন সন্তানের আশ্রয় পায়। ইমন ঘুম থেকে উঠেছে। তার চোখ লাল হয়ে আছে। বোধহয় রাতে ভালো ঘুম হয়নি। হাসান চা চায়নি। রিনা তার জন্য চা নিয়ে এসেছে। রিনা চা খুব ভালো বানায়। সবকিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে। দুধ চিনি কমবেশি হলে চায়ের স্বাদটা ঠিক থাকে না। রিনা সবচেয়ে ভালো বানায় আদা চা। এক কথায় অসাধারণ। একবার হাসানের সর্দি হয়েছিল। নাক দিয়ে চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। তার অস্বস্তি লাগছে। এমন সর্দি খুব কম লোকেরই হয়। রিনা ঘরে ঢুকে দেখে হাসান কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে। রিনা বলল ছোটো বাবা, আপনার কী হয়েছে? হাসান রিনার দিকে তাকাতেই চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল। হাসানের একটু লজ্জা লাগল। মেয়েটা কী ভাববে, মনে হয় সে কাঁদছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আগুন গরম এক কাপ আদা চা নিয়ে রিনা তার সামনে এসে হাজির। সেদিন চায়ের জন্য রিনাকে ধন্যবাদ দিতে তার মনে ছিল না। পরে আর দেওয়া হয়নি। আসলে সময়ের কাজ সময়ে না করলে আর হয় না।

হাসান আর ইমন দুজনেই ফিরোজ সাহেবের সামনে বসে আছে। তিনি খুব গম্ভীর মুখে বসে আছেন। মনে হয়, কঠিন কিছু বলবেন। কিন্তু সত্যি কথা হলো, তিনি কঠিন কথা বলতে পারেন না। কঠিন কথা বললেও তরল হয়ে যায়। একেবারে পানির মতো তরল।

ফিরোজ সাহেব বললেন, 'ইমন দাড়ি রাখছিস নাকি?'

ইমন কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে রইল।

ফিরোজ সাহেব এবার ভারি গলায় বললেন, 'কাল শুনলাম দোকানে গিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'টাকা এনেছিস?'

'জি।'

'কত?'

'আড়াই হাজার। জুতা কিনেছি। ছোটো কাকাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ছোটো কাকাই পছন্দ করেছে।'

কিনেছিস, ঠিক আছে। কিন্তু তুই তো মাঝেমধ্যেই টাকা আনিস। এত টাকা দিয়ে করিস কী? আমি যখন প্রথম কাজে ঢুকি। তখন আমার বয়স বেশি না। পড়াশোনা চালিয়ে গেলে বড়োজোর কলেজে উঠতাম। আমার জীবনের প্রথম বেতন মাত্র একশো টাকা। আর আমার ছেলে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে জুতা কিনে পরে। যুগের কত পরিবর্তন। সবকিছুই পালটে যাচ্ছে। আমাদের সময়ও ছিল আর এখনো সময়।

ফিরোজ সাহেব একটু থামলেন। মনে হয়, তার অতীত কোনো স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। সেই স্মৃতিতে তিনি হারিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'কাল্লু তোর তো পরীক্ষা শেষ। সারাদিন কী করা হয়? টোটো কোম্পানির ম্যানেজারি। নাকি চাচা-ভাতিজা দুজনকে একই রোগে পেয়েছে? আমি আর কতদিন, এভাবে চলবে? লিমন কিছুটা হাল ধরেছে। তা না হলে তো এত কিছু সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ত।'

হাসান বলল, 'রেজাল্ট তো বের হলো কিছুদিন হয়েছে।'

ফিরোজ সাহেব হাসানের কথা শেষ করতে না দিয়েই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তুই কি কোথাও চাকরি করতে চাচ্ছিস? চাকরি করলে কত পাবি? শেষে সংসার চালাতে ঘুস খেতে হবে। তুই আর ইমন বরং আলাদা কিছু কর। ব্যাবসার টাকা যা লাগে আমি দেবো।'

হাসান চুপ করে রইল। ফিরোজ সাহেব ইমনের দিকে তাকালেন। ইমন যে খুব ভয় পাচ্ছে তাকে যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। তার ভয়ে আত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু একটু পানির তৃষ্ণা পাচ্ছে। ফিরোজ সাহেব বললেন, 'ইমন, শুনলাম তুই অনেক রাত করে বাড়ি ফিরিস? এই চুপ করে থাকবি না।'

'জি।'

'এত রাত পর্যন্ত কী করিস?'

'কিছু না।'

'তাহলে বাইরে কী?'

ইমনের উত্তর দেওয়ার আগেই জোলেখা বেগম ঘরে ঢুকে ইমনকে প্রশ্নের সম্মুখীন থেকে বাঁচালেন। তিনি বললেন, 'এই সাতসকালে রাগারাগি শুরু করেছেন আপনি। এই তোরা ঘরে যা। আমি তোদের নাস্তা পাঠাচ্ছি। আর ওরা তো হাতিঘোড়া হয়ে যায়নি। সময় হলে একটা কিছু করবেই।'

ইমন মনে মনে বলল, মা তুমি কত ভালো। তুমি সময়মতো না এলে আমার যে কী হতো তা আল্লাহ মালুম। হরিণশাবক শিকারির হাত থেকে রক্ষা পেলে যেরকম অনুভূতি হয়। ঠিক তেমনি হাসান আর ইমনের অবস্থা। রুমে এসেই চাচা-ভাতিজা ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগল। হাসির শব্দ ফিরোজ সাহেবের কানে পৌঁছানোর ভয়ে তারা নিজেদের মুখ চেপে ধরল।

ইমন বলল, 'কাকা শোন! তোকে একটা মজার গল্প বলি। তুই তো জিতুকে চিনিস?'

'তোর বন্ধু জিতু তো?' ঐ যে পাতলা মতন ছেলেটা।'

'বাঃ! তোর তো স্মৃতিশক্তি দারুণ! দেখতে কেমন তাও তোর ঠিক ঠিক মনে আছে। আমাদের মধ্যে হিরো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে তোর এই ভাতিজা ইমন। তা তো জানিস?'

'দেখতে হবে না, ভাতিজাটা কার।'

'হি... হি... হি...।'

'জিতু সারাক্ষণ বকবক করতে থাকে। ননস্টপ টুইন ওয়ানের মতো। ওর একটা দারুণ ব্যাপার হলো কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না। মাথা নিচু করে বলবে। ওর পেট মাইয়া মানুষের পেটের চেয়েও খারাপ। ওর পেটে কোনো কথাই থাকে না। ধর, তোর কাছে একটা কথা বলল। কথাটা শেষ হওয়ার পরে সিরিয়াসলি তোকে— কথাটা কাউকে বলতে নিষেধ করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নিজেই ঢোল পিটিয়ে বেড়াবে।'

ইমন একটু থামল। সামনে যা বলবে কথাগুলো গুছিয়ে নিল। ইমন আবার বলতে শুরু করল, 'জিতুর সাথে একটি মেয়ের অ্যাফেয়ার আছে। মেয়েটিকে আমি দেখেছি। জিতুর সঙ্গে দারুণ মানায়। দুজন দুজনকে পছন্দ করে। মেয়েটি কলেজ থেকে ফেরার পথে জিতু প্রতিদিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করত। একদিন হলো কী? ঐ মেয়ে ভেবে জিতু অন্য একটি মেয়ের ওড়না ধরে যেই টান, অমনি মেয়েটা ঘুরেই ঠাস। জিতু তো একেবারেই 'থ'। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেয়েটি হনহন করে চলে গেল। আমার সঙ্গে জিতুর দেখা হলো। তখনো ওর গাল লাল হয়ে আছে। আমি বললাম, কিরে কী হয়েছে?'

জিতু ঘটনাটি আদিঅন্ত সুন্দর করে আমাকে বলল। আমি না হেসে পারলাম না। জিতু মুখ কালো করে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'দোস্ত কাউকে বলিস না। লজ্জার ব্যাপার কাউকে বলা যায় না।'

বিকেলে একজন একজন করে যাদের সঙ্গে ওর দেখা হলো তাদের সবাইকে মজাদার গল্পের মতো ঘটনা খুলে বলল। আর চেহারায় সিরিয়াস ভাব এনে শেষে বলল, 'দোস্ত ঘটনা কাউকে বলিস না। লজ্জার ব্যাপার কাউকে বলা যায় না।'

হি... হি... হি... করে হাসান হাসতে লাগল। হাসি থামতেই চায় না। এমন হাসি অনেকদিন পরে হাসল হাসান।

'হাসান ভাই কখনো প্রেম করেছেন?'

হঠাৎ হোসেন ব্যাপারীর এমন প্রশ্নে কিছুটা হকচকিয়ে গেল হাসান। ব্যাপারটা হালকা করার জন্য মুচকি হসল। কিছু বলল না। হোসেন ব্যাপারীর কাজ হচ্ছে দালালি করা। ছোটোখাটো নয়; বড়ো বড়ো ডিল করেন। সব সম্ভবের নাম হচ্ছে হোসেন ব্যাপারী। সব মুশকিলের আসান। হোসেন ব্যাপারীর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীতে। ঢাকা শহরে এত বছর থেকেও আঞ্চলিক ভাষায় বদল আসেনি তার। পরিচিত, অপরিচিত, অর্ধপরিচিত সবার সঙ্গে নোয়াখালী উচ্চারণে কথা বলেন। কেউ কোনোকিছু না বুঝলে তা তরজমা করেন। হাসানের সঙ্গে হোসেন ব্যাপারীর পরিচয়ের ছোটো একটু পূর্ব ঘটনা আছে। পরিচয়ের পর থেকে মাঝেমধ্যেই হোসেন ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা করতে আসে হাসান।

হাসানকে চুপ থাকতে দেখে হোসেন ব্যাপারী বললেন, 'কইরেন না। না করলে আর প্রেম ভালোবাসা করিন নো। জীবনটা এক্কেরে ফানাফানা হই যাব।' হাসানের প্রেম-ভালোবাসার সম্বন্ধে এসব কথা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু রোদও আছে। রোদবৃষ্টি একসঙ্গে হচ্ছে। হাসান জানালা দিয়ে তাই দেখছিল। হোসেন ব্যাপারী আবার শুরু করল, 'দেহেন, দেহেন, কী লাহান হইছে, রইদবৃষ্টি একলগে হইছে। আমাগো দেশে একটা প্রবাদ আছে। হুনেন প্রবাদটা, 'রইদ আর বৃষ্টি অয়, হিয়াল মামার নিকা অয়।'

হোসেন ব্যাপারী একটু নীরব থেকে হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবার বললেন, 'আসলে মাইনষের বিয়াত তো কার্ড ছাপায়া দাওয়াত দেওয়া লাগে। ওনাগো বিয়ায় কার্ড ছাপান যায় নো। আর কী মনে অয় জানেন নি?'

হাসান মাথা নেড়ে বলল 'জানি না।'

'মনে অয় তারা সবাইরে এইভাবে দাওয়াত দেয়।' হোসেন ব্যাপারী নিজেই নিজের কথায় হাসলেন।

'হাসান ভাই, আনরে যা কই, প্রেম-ভালোবাসার কথা। তার আগে আর এক জ্যাঠাতো ভায়ের কথা হুনেন। ওগো অবস্থা বেশ একটা ভালা নো। আর ভাইয়ের নাম হইতাছে মিলন। হেটে ভাত নো থাকলেও মিলইন্নার চলাফেরা আছিল অন্যরকম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাবান দিয়া মুখ ধুইত। প্রতিবার মুখ ধোয়ার পর ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখাত। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি চিনেন নি? ঐ যে একটা অ্যাডভ্রাইস দেয় নো, হাত হপ্তায় রং সোন্দর। ফকফকা।'

'ভাতিজা বেকার ঘুরেফিরে দেহি আর আরেক জ্যাঠা। উনার রেডিমেড হোসাগোর দোকান। জ্যাঠা বোঝন নি? বাপের বড়ো ভাই। দিনাজপুর এক ব্যাবসাইতের কাছ থন লাখখানিক টেয়া পাইত। মিলনরে সেই টেয়া আনত দিনাজপুর পাঠাইল। দিনাজপুর গিয়া লোকটার কাছে টেয়া চাইলে লোকটায় বেকায়দায় পড়ি যায়। মিলনরে কয়, আন্নে হপ্তাখানেক এহানে থাকেন আই টেয়ার ব্যবস্থা করি দেই। মিলনের জন্য ভালা থাকার ব্যবস্থা কইরা দেয়।'

হোসেন ব্যাপারী থামলেন। হাসান এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতার মতো শুনছে। হোসেন ব্যাপারী হঠাৎ থামলেন দেখে হাসান একটু উৎসুক হয়ে উঠল। হোসেন ব্যাপারী কী বুঝলেন— মুচকি হেসে বললেন, 'মিলইন্না ওর স্বভাবমতোই পাঙ্কু স্টাইলে মাইয়াগো কলেজের সামনে দাঁড়ায় থাকে। ওর যেই ভাব দেহি চিন্তাই করা যায় নো। দুদিনের মধ্যেই একটা মাইয়ারে পটায়ে ফেলল। মাইয়ার নাম ডলি। আর মিলইন্না তো সকালে পরি যায় এক হোসাগ আর কলেজ ছুটির সময় পরি যায় আরেক হোসাগ। কী ভাব, বুঝছেন নি। মাইয়া এই হাবভাব দেহি এক্কেবারে টাসকি লাগি গেছে। দিনাজপুরের কাজশেষে যেদিন ঢাকায় চলি আইব। সেদিন মাইয়ারে গিয়া কয়, এহানকার কাজ শেষ। আই ঢাকা চলি যাই। ডলি কয় তাইলে আরেও লগে লইয়া যাও। বুঝেন ঠ্যালা। সত্যি সত্যিই মিলইন্না ডলিরে লই পালাইল। ঢাকার টিকিট করি এক্কেবারে বাসে উঠি বসল। বাসে বসেই ডলিরে বেবাক সত্যি কথা হুনায়। আসলে ঐ সময় মাইয়াটার ফিরা যাইবার পথ নাই।'

হাসান বলল, 'এখন আপনার সেই ভাই কেমন আছে?'

হোসেন ব্যাপারী একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এখন মালয়েশিয়া।'

'এইবার আর কথা কই। এগা মাইয়া আই ভালোবাসতাম আর কি। রুনিও আরে ভালাবাসতো। হাসান ভাই, বিশ্বাস কইরবেন? আঁধার রাইতে রুনির সাথে কত দেহা করছি। হঠাৎ একদিন রুনির বিয়া অই গেল।'

আর তো নাওয়াখাওয়ার ঠিক নাই। শরীল খারাপ। ডাইরেক্ট অ্যাকশন। মায়ে কয়, পোলারে কেউ বাণ দিছে; তাবিজ করছে। শত অইলেও মায়ের

পরান তো! পরে ঠিক করল আরে বিয়া দিবো। কিন্তু আই তো রাজি নো। একটার পর একটা মাইয়া দেহায়। আই কই, হচ্ছন্দ নো। আর বড়ো বইনের জামাই এক মাইয়ার খোঁজ আনল। বাধ্য অই হেই মাইয়া দেখতেও গেলাম। হেই বাড়িত যেই খাওন আই খাইছি এহনো হেই ছোয়াদ জিবে লাগি রইছে।' এ সময় হোসেন ব্যাপারী তার জিহ্বা বের করে দেখাল। পান-সুপারির অভ্যাসে আর অযত্নে লালচে হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো চোখে পড়ল হাসানের। দাঁত দেখে হাসানের স্কুলবন্ধু ডেন্টিস্ট আবদুল হকের কথা মনে পড়ল। ভিক্টোরিয়া পার্কে পেট্রোল পাম্পের কাছেই আবদুল হকের চেম্বার। হোসেন ব্যাপারীকে একদিন সেখানে নিয়ে যেতে হবে দাঁত ফিলিং করাতে। হাসান বললে একদম বিনা পয়সায় হোসেন ব্যাপারীর দাঁত দেখে দেবে আবদুল হক। গত সপ্তাহে সদরঘাট থেকে হাঁটতে হাঁটতে পেট্রোল পাম্পের সামনে আসতেই দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। ঠিক ওর চেম্বারের কাছে। হাসানকে চেম্বারে নিয়ে যাবে। হাসান যায়নি। কিছু না খাইয়ে ছাড়বেই না। পরে দুজনে ডাব কিনে খেলো। ডাবটায় অনেক পানি হয়েছিল। নোয়াখালীর ডাব ছিল মনে হয়। ঐ এলাকায় ভালো ডাব পাওয়া যায়।

হোসেন ব্যাপারী ডাকল, 'হাসান ভাই।'

হাসান বলল, 'হুঁ'। হাসান মনে মনে ভাবল, হোসেন ব্যাপারীকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথাটা এখনি বলবে।

হোসেন ব্যাপারী তার নিজস্ব ঢঙে আবার শুরু করল, 'দুলাভাই কই দিছে, মাইয়া দেহি তার হাতে হাঁচশো টেয়ার নোটটা দিবারলাই। কিন্তু মাইয়া দেহি তার হাতে কত দিলাম কইতে পারুম নো। তয় পরে হুনলাম ঐডা দশ টেয়ার নোট আছিল। বাড়ি আইলে মায়ে কয়, কিরে মাইয়া কেমুন? আই কই কালির পাইল্লার লাহান। মায়ে কয় এত কালা। ইন্দুর বিলাই খাই হালাইছে, বিশ্বাস করে নি কন?'

হাসান মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলো, 'কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আর ও জারিজুরি বেগগল ফাঁস অই গেল। বড়ো আফা মায়ের কাছে আইয়া কয়, তোমার পুতের লাই আর তো ঘর ভাঙ্গি যায়। মা তো কোনোকিছু বুঝে নো। শুধু মুখে কইল, কী হইছে?'

'হোসেনের দুলাভাই যে মাইয়া দেখছে তার মতন এগগুয়া মাইয়া কি দশ গাঁয়ে আছে নি?'

মায়ে আগামাথা কিছুই বুঝল না। বড়ো আফার লগে হেইদিন মাইয়া দেহি তো হেতি অবাক। নিজের হাতের বালা খুলি মাইয়ারে পরাই দিছে।

'আই বিয়াত কেন রাজি নো আর এক বন্ধুর কাছ থন সব জানল। সব জানিহুনি ঢাকায় জ্যাঠারে খবর দিলো। বড়ো জ্যাঠারে আই বাঘের লান ভয় পাই। বড়ো জ্যাঠা আরে কইল, আইজ বিয়া। আর তো নাক-কান দিয়া গরম হাওয়া বাইর হওন শুরু। কী করি। আই মাথা নিচা কইরা কইলাম, মাইয়া ববিতার লাহান সুন্দর। জুয়েলের লগে বিয়া দিয়া দেন। জুয়েল বড়ো জ্যাঠার ছাওয়াল। এই কথা হুনি তো তার চোখ দিয়া আগুন বাইর হইচ্ছে মনে অয়।'

'একদিন বিয়ালে আর বন্ধু আইয়া কইল, দোস্ত সবাই যা চায় তুই হেইটা মানি বিয়াটা করি হালা। তা না হইলি ফরহাদের লাহান শিরি শিরি কইরা যাবি। আর শিরি স্বামী-সংসার বাচ্চাকাচ্চা নিয়া সুখে কাটাইব। ওর বাচ্চার মামা, মামা ডাক হুনি তোর কলিজা ফালাফালা হই যাইব।'

হাসান বলল, 'শেষে কী করলেন? তাকেই বিয়ে করলেন?'

'হুঁ' ভাই। মনে হয় বিয়া করি ঠকি নো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হোসেন ব্যাপারী বললেন, 'রুনুরে ভুলবার পারছি নি, জানি নো। আসলে হাসান ভাই, ডাউলের মজা যেমন তলে, প্রেমের মজা ছ্যাঁকে। এইডাই হাচা কথা।'

বাইরে থেকে অনেক কিছু দেখেই ভুল ধারণা হয়। আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কারো কারো হয়তো এমন ধারণা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে হাসান আর তার মা মনোয়ারা বেগম সুখেই আছেন। সুখ যে কী তা দুঃখীরাই জানে। হাসানের মনে কতটা দুঃখ ছিল তা তো আর সব জানি না। বাইরে থেকে যতটুকু দেখেছি তাতে আঁচ করাটা খুব কষ্টকর। এবার ভেতরের কিছু বলি। একদিন হঠাৎ হাসানের ডায়ারি আবিষ্কার করলাম। পাতা উলটাতেই দেখি লেখা আছে, 'মা কাঁদছে। আমার বুঝতে বাকি নেই। কেন, মায়ের চোখে পানি। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমার মায়ের কান্নাটুকু মুছে ফেলার অধিকার বা ক্ষমতা আমায় দেননি।'

পৃথিবীর সব মানুষ ফিরোজ সাহেব না। কেউ কেউ আবার রাম, শ্যাম, যদু, মধুও আছেন। তেমনি কোনো কোনোদিন যদি হাসানের সৎবোনেরা এই বাড়িতে আসে। সেদিন মনোয়ারা বেগমকে হতে হয় গৃহবন্দি। আর হাসানকে হতে হয় বাড়িছাড়া। তাদের নানা ধরনের কটূক্তি এবং হাড় জ্বালানো কথায় দুনিয়ার এমন কেউ নেই; যে তাদের চোখে পানি আসবে না। এমনি করেই দিন চলে যায়। এ থেমে থাকার জিনিস না। ভাদ্রের অসম্ভব রোদের তাপে একটু ছায়া পাওয়া যায় বটগাছের তলায়। ফিরোজ সাহেব সেই বটগাছ। অজান্তেই হাসান আর তার মা— এ দুটি জীব আশ্রয় নিয়েছেন সেই বটগাছের তলায়।

হাসানের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। পঞ্জিকা ধরে সেই হিসাব কখনো করিনি। তাই কখন থেকে তার সঙ্গে পরিচয় ঠিক করে বলা যাবে না। হাসানকে যতটুকু দেখেছি, চিনেছি তাতে কোনোদিন সে মুখ ফুটে মনের কথা বলেনি। এমন লোক কমই দেখেছি যে হাসানের সাথে কথা বলে মুগ্ধ হয়নি। ওর কী আশ্চর্য চোখ! কী অপূর্ব সম্মোহিত করার শক্তি! কিন্তু অনেককে দেখেছি হাসানের সাথে কথা বলেই একেবারে বাড়িতে নিয়ে দুপুরের ভাত খাইয়ে ছেড়েছে। তার মনে যতই ব্যথা থাক সে একাই সহ্য করেছে। মুখ ফুটে কোনোদিন কাউকে বলেনি। কিন্তু অন্যের ব্যথা কমিয়েছে

বা ব্যথার ভাগ নিয়েছে। সবাই তার কাছে মনের কথাগুলো বলে হালকা হয়। স্কুলে যখন পড়ি হাসান আর আমি এক গণিত স্যারের কাছে পড়তাম। কত বছর হয় সেই স্যারের কাছে পড়া শেষ হয়ে গেছে মনে নেই। হাসান প্রায়ই আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্যারের বাসায় যেত। স্যার আর স্যারের বউ সংসারের টুকিটাকি বিষয় নিয়ে হাসানের সঙ্গে কথা বলতেন। যা শুধু অনেক আপন কাউকে ছাড়া বলা যায় না। আমি সেখানে নীরব দর্শক। হাসানের সবকিছুতেই আমার মধ্যে মুগ্ধতা ছড়াত।

সজীব গতকাল তিনবার হাসানের খোঁজে এসেছে। হাসান বাসায় ছিল না। তাই হাসান সকালে উঠেই ঠিক করেছে সজীবের সঙ্গে দেখা করতে তার মেসে যাবে। হাসান বের হয়ে প্রথমেই সজীবের জন্য একটি শার্ট কিনল। রংটা দারুণ। সজীবের গায়ের রং সুন্দর, ওকে মানাবে। তারপর হাসান সজীবের মেসে পৌঁছল। সজীব ডিম ভাজছিল। দরজা নক করার শব্দ পেয়ে ডিম ভাজা শেষ করে দরজা খুলল।

'কিরে এতদিন পর বুঝি সজীবকে মনে পড়ল।'

'পড়ল বলেই তো এলাম।'

'ভেতরে আয়।'

'কী করছিলি?

'এইমাত্র ডিম ভাজলাম এখন পান্তাভাত দিয়ে নাস্তা করব। আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারিস।'

'ঠিক আছে দুই প্লেটেই ভাত বাড়। দাঁড়া, আমি আরেকটা ডিম নিয়ে আসছি।'

'তোর আর ডিম আনতে হবে না। আমি দুটাই ভেজেছি। আমি জানতাম তুই আসবি।'

'বাঃ! তুই আবার জ্যোতিষ হলি কবে থেকে।'

'এ জানতে আবার জ্যোতিষ হতে হয়। এ হচ্ছে মনের টান। আর আল্লাহর কাছে মন থেকে কিছু চাইলে তা দেয়, বুঝলি। আমি মনে মনে তোকেই চাইছিলাম।'

'ঠিক আছে লেকচার বন্ধ। ভাত বাড়, তাড়াতাড়ি।'

'জো হুকুম, বলে সজীব ভাত বাড়তে শুরু করল।

হাসান ভাত খেতে খেতে বলল, 'তুই তো দারুণ ডিম ভাজিস। তোর হাতের ডিম ভাজা যদি তোর বউ খায়; তাহলেই সেরেছে। তোকে আজীবন রান্নাঘরেই থাকতে হবে।'

'তাই নাকি? এ যে স্বপ্নে পাওয়া ডিম ভাজা।'

'হি... হি... হি...।'

'সজীব খাওয়া তো হলো এবার রেডি হ দোস্ত। তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।'

'কিন্তু বন্ধু, আমি তো যেতে পারব না।'

' কেন?'

'আমার দুটি শার্টই বালতিতে। এখনো ভেজা।'

টেবিলে রাখা শার্টের প্যাকেটটা হাসান সজীবের হাতে দিলো। প্যাকেটটা খুলে সজীবের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। এ হচ্ছে বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার জল। কলেজে একবার বেতন দেওয়ার সময় তিনশো টাকা টান পড়েছিল। টাকাটা সেদিনই জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। হাসান সেই টাকাটা দেয়। আজও সে টাকাটা হাসান নেয়নি।

সজীব শার্টটা পরল। আসলেই শার্টটায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে সজীবকে। খুব কষ্ট করে সজীবকে চলতে হয়। টিউশনি করে যা পায় তা নিজের খরচ চালিয়ে আবার সংসারের খরচের জন্য গ্রামে পাঠাতে হয়।

সজীবকে তুপাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে হাসান। তুপা অনার্স করছে। তুপার রূপের বর্ণনা করা অসম্ভব। চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে যাওয়া নির্বোধের কাজ। কারণ বিশ্লেষণে শরীরটাই চোখে পড়ে, রূপ ধরা পড়ে না। তুপা সুন্দরী। এক কথাতেই তার বিচার করা হয়ে যায়। হালিম সাহেবের একমাত্র মেয়ে তুপা। নির্বিঘ্নে তাকে বিত্তবান বলা চলে। ঢাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি, গাড়ি, ব্যাবসা সব মিলিয়ে ভালোই আছেন। বেশিরভাগই তার মেয়ে তুপার নামে। গুলশানের এই নতুন বাড়িতে এসে উঠেছেন দুবছর হলো।

তুপাদের বাড়িটা ছিল হাসানদের বাড়ির সাথেই। হাসান খুব ছোটোবেলা থেকেই তুপাকে পছন্দ করে। সেই ভালোলাগা থেকে ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। আজও তুপাকে এ কথা জানায়নি। ছোটোবেলা থেকেই হাসান আর তুপা বন্ধু। হাসানের একমাত্র মেয়েবন্ধু তুপা। তুপার একমাত্র ছেলেবন্ধু হাসান। পৃথিবীতে হাসান বেঁচে থাকতে চায় তুপাকে পাওয়ার জন্য।

হাসান পরপর দুবার কলিংবেল চাপল। দরজা খুলল তুপা। আজ তার কলেজ বন্ধ। তুপা শাড়ি পরেছে। তাকে বেশ বড়ো বড়ো দেখাচ্ছে।

তুপা বলল, 'হাসান ভাই কেমন আছো?'

'ভালো। তুমি?'

'আমিও ভালো আছি।'

তারা তিনজন ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল। ছিমছাম সাজানো-গোছানো রুম। পুরো ঘরটা কার্পেটে মোড়া। দামি দামি জিনিসপত্রে ঠাসা। দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্র। সজীব এগুলো মুগ্ধ চোখে দেখছিল।

হাসান বলল, 'তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।' হাসান তুপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও হচ্ছে নুসরাত জাহান তুপা। আর এ আমার বন্ধু সজীব।'

তুপা বলল, 'আপনাকে খুব পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে।'

সজীব বলল, 'হাসানের মুখে আমার কথা শুনেছেন হয়তো।'

'না। হাসান ভাই, আপনার কথা কখনো বলেনি।'

'তাহলে আপনি মনে হয় হিন্দি মুভি দেখেন?'

তুপা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনাকে পরিচিত মনে হওয়ার সাথে হিন্দি মুভি দেখার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে। বন্ধুরা বলে, আমি নাকি বোম্বের শাহরুখ খানের মতো দেখতে।'

তুপা ভুরু কুঁচকেই বলল, 'তাই নাকি।'

তুপার ভুরু কুঁচকানো দেখে হাসান আর সজীব হেসে ফেলল। তুপা লক্ষ করল সজীবের হাসিটা খুব সুন্দর। শাহরুখ খানের মতো দেখতে না হলেও স্মার্ট। মেয়েরা তো এমন সুদর্শন ছেলেই আশা করে। তুপা, ইতোমধ্যে হাসানের আর সজীবের সঙ্গে মিল-অমিল বের করতে শুরু করেছে। সব মেয়েরাই এমনটা করে। একটার সাথে অন্যটার কোথায় মিল এবং অমিল তা খুঁজে বের করাটাই তাদের প্রধান কাজ।

সজীব বলল, 'কী চুপ হয়ে গেলেন যে।'

তুপা বলল 'কই না তো।'

'কিছু ভাবছিলেন?'

'না। হাসান ভাই, তুমি কিন্তু অনেকদিন পরে এলে।'

হাসান কোনো কথা বলল না। সত্যি হলো, হাসান প্রতিদিনই তুপাদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে যায়। বারান্দায় তাকিয়ে থাকে। তুপাকে দেখার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে তুপাকে দেখতে। বাড়িতে ঢোকে না। এটি হাসানের রুটিন কাজ। তুপা এ কথা জানে না। তাই হাসান মনে মনে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তুপার মা নাস্তা নিয়ে এলেন। বললেন, 'হাসান তুমি আজ দুপুরে খেয়ে যাবে। না বলতে পারবে না। সাথে মেহমান আছে।' হাসান চুপ করে রইল কোনো উত্তর দিলো না।

তুপা কী বলবে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। সে সজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার শার্টটা খুব সুন্দর। আপনাকে মানিয়েছে বেশ।'

সজীব বলল, 'পছন্দটা কিন্তু আমার না, হাসানের?'

'হাসান ভাইয়ের পছন্দ! তাই নাকি? তার পছন্দ এত সুন্দর জানা ছিল না।'

হাসান বলল, 'তুপা, তুমি আমার কতটুকু জানো?'

তুপা এ কথাটার অর্থ বুঝল না। কিন্তু হাসান জানে, তুপা তার কিছুই জানে না। সে যে তুপাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। এটাও তো জানে না তুপা। শুধু জানে হাসান তুপার খুব ভালো বন্ধু। স্রেফ বন্ধু।

পুরোটা বেলা তিনজনের মধ্যে টুকটাক কথা হলো। সেসব লেখা সম্ভব নয়। আর তা শোনারও কারো ধৈর্য থাকবে না। দুপুর হলো। খাবার টেবিলে রকমারি খাবার। একেবারেই সব বাঙালিপনা খাবার বলা চলে। বেগুন ভর্তা, করলা ভাজি, আলু-পটোল ভাজি, পেঁপে দিয়ে মাংস রান্না আর ডাল। মিনিকেট সরু চালের ভাত। দুপুরের খাওয়া ভালোই হলো। অনেকদিন পরে সজীব আজ একেবারে বাড়ির মতো করে দুপুরে খেলো। এমনি সে তিনবেলা মেসেই খায়। প্রথম প্রথম মেসের রান্না মুখে দিতে পারত না। এখন বেশ খেতে পারে। অসুবিধা হয় না। মাঝেমধ্যে সজীব নিজেও রান্না করে। সেদিন শুক্রবার সকাল থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি। বুয়া আসেনি। এমন বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে হয়। সজীব নিজেই খিচুড়ি রান্না করার রিস্ক নিয়ে নিল। রাকিব ভাই বললেন, 'গোরুর মাংসের সঙ্গে খিচুড়ি হলে মন্দ হয় না, কী বলো।' সজীব আমতা-আমতা করে বলল, 'গোরুর মাংস!' রাকিব ভাই বলল, 'নো চিন্তা। আমার মানিব্যাগ বেশ হেলদি। চিন্তা কোরো না। আমি মাংস কিনে আনছি।'

খাওয়ার সময় তুপা কোনো কথা বলল না। বাড়ির গেটে এগিয়ে দিতে এসে তুপা বলল, 'হাসান ভাই, সপ্তাহে একবার হলেও আসবে। না, আস্‌লে আমি ভীষণ রাগ করব।' তুপা সজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও আসবেন।'

হাসান কোনো উত্তর দিলো না। সজীব বলল, 'আমি।'

সজীব আর হাসান গেটের বাইরে বের হয়ে এলো। দুজনেই চুপ হয়ে আছে। তারা দুজনেই হয়তো একজনকে নিয়েই ভাবছে। সে— তুপা।

'দাদা, বাড়িটা তো একেবারে অনাথাশ্রম করে তুলেছে। তুমিও আছো ভাবি, দাদাকে কিচ্ছু বলো না।'

জোলেখা বেগম উত্তর দিলেন না। তিনি জানেন তার সব ননদরাই এ বাড়িতে এসে এসব কথার মালা জপতে থাকেন। তিনি এগুলো কানে তোলেন না। জোলেখা বেগমকে চুপ দেখে তার ননদ লিলি বেগমও মুখ ঝামটে বলতে লাগলেন, বাবা কোথাকার কাকে বিয়ে করেছেন এ কথা শুনেই, মা আর বাঁচল না। আর দাদা কি না সেই ঘরের সন্তানদের লেখাপড়া করিয়ে মানুষ করতে চাইছে। আবার কতগুলো টাকা খরচ করে মলি মণির বিয়ে দিলেন। এও কী কারো সহ্য হয়।

জোলেখা বেগম বললেন, 'তুমি চুপ করবে?'

লিলি বেগম যেন আরও জ্বলে উঠে বললেন, 'চুপ করবই তো। চুপই তো করব। আমার বাপের বাড়ি আর আমাকে এসে চুপ করে থাকতে হবে।'

মনোয়ারা বেগম পাশের ঘর থেকে সবই শুনছেন। আজ তিনি ঘরের বাইরে বের হবেন না। কেউ একজন গিয়ে তার ঘরে খাবার দিয়ে আসবে। লিলি বেগমকে দেখেই হাসান বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে জানে বাড়িতে এখন থাকা নিরাপদ নয়। বিপৎসীমার ওপরে চলে গেছে। থাকলেই নানা কথা কানে আসবে। তার ওপর তার মা মনোয়ারা বেগমের কান্না তাকে দেখতে হবে। কিন্তু তার কিছুই করার থাকবে না। হাসান দুপুরেও বাসায় ফিরবে না। বাইরে কোথাও কিছু খেয়ে দুপুরটা কাটিয়ে দেবে। জোলেখা বেগম বুঝতে পারছেন তার শাশুড়ির কানে সব কথাই যাচ্ছে। ফিরোজ সাহেব এসব কথা জানতে পারলে কষ্ট পাবেন। এমনও হতে পারে জোলেখা বেগমের সঙ্গে দুদিন কথা বলবেন না। যেন সব দোষ তার।

জোলেখা বেগম শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তোমার চুপ করার দরকার নেই। তোমার চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে করো। যত মনে চায় একা একা চিৎকার করো। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

লিলি বেগম আঁতকে উঠে বললেন, 'ও মা! তুমি রান্নাঘরে যাবে? তুমি বসো। আজ আমার মেয়ে নাজমা রান্নাঘরে যাচ্ছে। ওর রান্না একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। সব রান্না জানে। তুমি বসো।'

'সে কী, নাজমা কেন রান্নাঘরে যাবে। এ তোমার অনেক বাড়াবাড়ি লিলি।'

'কেন, বাড়াবাড়ি হবে। এটা নাজমার পরের ঘর? তুমিই বলো?'

'আমি কি কখনো বলেছি। আমার কোনো মেয়ে নেই। নাজমাই তো আমার মেয়ে।'

নাজমা, লিলি বেগমের মেয়ে। এমন রগচটা মহিলার ঘরে কীভাবে এত ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি হলো তা ভাবতে গেলে হিসাব মিলবে না। মায়ের নানান বিষয়ে নাজমা বিরক্ত। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। নাজমা দেখেছে তার মা তার বাবাকেই ছাড়ে না। তার মনে হয়, তার মাকে তার বাবাও যমের মতো ভয় পায়। একটু পান থেকে চুন খসলেই কাজের লোকগুলোর ওপর লিলি বেগমের রাগারাগির সীমা থাকে না। নাজমার বয়স খুব বেশি হলে আঠারো কিংবা উনিশে পড়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ বুঝে গেছে তার মা লিলি বেগম কী চাইছে। তার মামাতো ভাই ইমনের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। নাজমাও ইমনকে পছন্দ করে। কিন্তু ইমন করে কি না সে বুঝতে পারে না।

জোলেখা বেগমের কথা শুনে লিলি বেগমের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। ফিক করে হেসে বলে, 'তাহলে যে বললে, এ আমার বাড়াবাড়ি।'

জোলেখা বেগম বললেন 'বাড়াবাড়িই তো। মেয়েটি এতদিন পর মামাবাড়ি এসেছে। কী, লিমনের বউ, ইমনের সঙ্গে গল্প করবে। তা না, তুমি ওকে রান্নাঘরে পাঠাতে চাও।' জোলেখা বেগম নাজমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাজমা যা তোর ভাবির ঘরে যা। তোর মা তোকে রান্নাঘরে পাঠাতে চাইছিল না? এখন দেখ, তোর মাকেই আমি রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছি।' কথাটা শেষ করেই তিনি হি... হি... হি... করে হাসতে লাগলেন।

নাজমা উঠে দাঁড়াল। অজান্তেই একটি ছোটো নিঃশ্বাস পড়ল তার। এতক্ষণ পর দমবন্ধ হওয়া ভাবটা চলে গেছে। তার মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। নাজমা জানে তার মা হাসান মামাকে একদম দেখতে পারেন না। কিন্তু সে এ বাড়িতে এলেই হাসানের ঘরে যাবে। ছোটো মামার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলবে। যদি দেখে হাসান মামা আছে, তাহলে কোনো উত্তরের আশা না করেই বলবে, 'ছোটো মামা, কেমন আছো?' তারপর বিছানায়

গিয়ে বসবে। শেষে একের পর এক কথা বলেই যাবে। হাসান কোনোটার উত্তর দেবে। আবার কোনোটার উত্তর দেবে না। ফিরোজ সাহেবও নাজমাকে খুব ভালোবাসেন। তিনিও মনে মনে তার ছোটো ছেলে ইমনের জন্য নাজমাকে বউ করে আনতে চাইছেন। কিন্তু তার মনে একটাই ভাবনা, নাজমা কী সুন্দর একটা মেয়ে। আর তার ছেলে ইমন শুধু বন্ধুদের নিয়ে টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। শেষে না নাজমার জীবনটা দুঃখে দুঃখে যায়।

নাজমা ইমনের ঘরে ঢুকল। ইমন টেবিলে বসে কী যেন করছিল। ইমন— নাজমাকে আগে তুই তুই করে কথা বলত। হঠাৎ করে তারা দূরে সরে গেছে। এখন যেন দুজন দুজনকে লজ্জা পায়। কিন্তু ছোটোবেলায় কোনো লজ্জা থাকে না। সংকোচ থাকে না। মেয়ে ছেলের প্রভেদ থাকে না। ছোটোবেলায় ইমন আর নাজমা কানামাছি খেলার সময় ইমনের ধাক্কায় তার কপালে চিড়ে যায়। সে কী রক্ত। ইমন তখন বুদ্ধি করে চোখ বাঁধার গামছাটা দিয়ে নাজমার কপাল বেঁধে দেয়। নাজমা একটুও কাঁদেনি। সে ফিরোজ সাহেবের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ফিরোজ সাহেব আঁতকে ওঠেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। নাজমা কাউকে বলেনি ইমন তাকে ধাক্কা দিয়েছে। এগুলো এখন তাদের কাছে সুখস্মৃতি।

ইমন চোখ তুলে চাইল। নাজমাকে দেখে বলল, 'কখন এলে?'

'অনেকক্ষণ। কেমন আছো?'

'ভালো। আর কে এসেছে? ফুপু?'

'হুঁ। কী করছিলে? আমি কি ডিস্টার্ব করলাম?'

'কই, না তো। তেমন কিছু করছিলাম না। দাঁড়িয়ে কেন বসো।'

'বসব না।'

ইমন আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কেন?

নাজমা এর কোনো উত্তর দিলো না। আসলে তার লজ্জা লাগছে। সে কত কী ভেবে এসেছিল। ইমনকে কত কী বলবে। সে নিজেই নিজেকে বিদ্রুপ করে বলল, হায়রে মেয়েমানুষ! বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

এমন সময় রিনা এসে বলল, 'নাজমা! তুমি এখানে। আর আমি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে মরছি। শোনো, একটা দারুণ ছবি এনেছি। তুমি আর আমি দেখব বলে।'

'কী ছবি?'

'কুছ কুছ হোতা হে। শাহরুখ খানের ছবি। তাড়াতাড়ি চলো।'

নাজমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল রিনা।

সজীবের পকেটে চকচকে দুটি পাঁচশো টাকার নোট। এইমাত্র সে মীমদের বাসা থেকে বের হয়েছে। মীমকে পড়ানোর বেতন পেয়েছে। এখনো মাস শেষ হয়নি। মাস শেষ হতে আরও তিনদিন বাকি আছে। সজীব ফুটপাত দিয়ে এলোমেলোভাবে হাঁটছে। মীমদের টিউশনিটা আজ চলে গেল। তারা ডিবি লটারি জিতেছে। সব ঠিকঠাক। কিছুদিন পরেই স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় ফুল ফ্যামিলি চলে যাবে। সজীব ভাবছে যাদের যত বেশি আছে আল্লাহ তাদের আরও বেশি করে দেয়। মীমরা এমনিতেই কোটিপতি। তার ওপর আবার ডিবি লটারি পেয়ে এখন চলে যাচ্ছে আমেরিকা।

গুলিস্তান হলের সামনে যারা ডিবি ফর্ম ডেকে ডেকে বিক্রি করে। সেখান থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে ফর্ম কিনে সজীবও কয়েকবার পাঠিয়েছিল। তার ভাগ্যে আমেরিকা যাওয়া জোটেনি। তার মাঝে মাঝে অনর্থক ভাগ্যের ওপর জেদ হয়। অসহায় মানুষের সবচেয়ে রাগ হয় তার চার আঙুলের কপালের ওপর। সব সুখদুঃখের জন্য কপালকেই গালি দেয়।

সজীবের মেসে ফিরতে রাত হয়ে গেল। সবকিছু স্বাদহীন মনে হচ্ছে। এটি শরীর খারাপ করার প্রথম লক্ষণ। সজীবের ভাত টেবিলে রাখা ছিল। না খেয়েই শুয়ে পড়ল। সে সারারাত ঘুমাল নাকি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল। ঠিক বোঝা গেল না। রাতেই প্রচণ্ড জ্বর এলো। গভীর রাতে জ্বর আরও বাড়ল। একশো দুই-তিন হবে। তাকে মাথা মুড়ি দিয়ে জড়সড়ো হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে রুমমেট রাকিব বলল, 'তোমার কি জ্বর এসেছে?'

'হুঁ। কাল রাত থেকেই।'

'বলো কী? জ্বর কি অনেক?

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

' দেখি, মাথাটা সামনে আনো তো।'

রাকিব মাথায় হাত দিয়ে দেখল সজীবের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। অনেক জ্বর। তার মাথায় এখনি পানি ঢালতে হবে।

রাকিব বলল, 'তোমার তো গা পুড়ে যাচ্ছে। কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'তোমার মাথায় এখুনি পানি দিতে হবে। আমার একটু তাড়া আছে। না হলে, আমিই মাথায় পানি দিতাম। আমি যাওয়ার আগে কাজের বুয়াকে বলে যাচ্ছি। সে যেন তোমার মাথায় পানি ঢালে। আমার জন্য নাস্তা এনেছিলাম। তুমি খেয়ে— একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিয়ো। ঐ টেবিলটার ড্রয়ারে আছে। আমি পরশু এনেছি। নষ্ট হয়নি।'

সজীব আস্তে মাথাটা কাত করে বলল, 'আচ্ছা।'

'বুঝলে ভাই, তোমার এমন শরীর খারাপেও থাকতে পারছি না। একটা ইন্টারভিউ আছে। দোয়া করো।'

রাকিব চলে গেল। বুয়া এসে সজীবের মাথায় পানি দিয়ে দিয়েছে। ঠান্ডা পানি দিয়ে গা মুছে দিয়েছে। বমি করে পুরো মেঝে মেখে ফেলেছিল। যা খেয়েছিল সব পেট থেকে বের হয়ে গেছে। বমিতে পুরো ঘর একেবারে একাকার। নিজেই পরিষ্কার করেছে। তবুও সজীবের নাকে বমিবমি গন্ধ আসছে। বমি করার পর একটু আরাম লাগছে। সজীবের গ্রাম থেকে গতকাল একটি চিঠি এসেছে। সেই চিঠিটা এখনো পড়েনি সজীব। বালিশের নিচ থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করল।

বাবা সজীব,

পত্রে দোয়া রইল। আশা রাখি ভালো আছো। আমরা আল্লাহর রহমতে কুশলেই আছি। পরসমাচার তোমার বোন বকুলের জন্য একটি ভালো পাত্র পেয়েছি। পাত্রটা হাতছাড়া করতে চাই না। তাই তোমাকে ছাড়াই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি। আগামী ফাল্গুনেই বিয়ে। বাবা, বিয়ের অনেক খরচাপাতি আছে। একটামাত্র বোন। তুমি বিয়ের আগে আগেই এসে এখানকার সব ঠিকঠাক করো। আর বিলপাড়ে যেই জমিটা আছে। আমি বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। তাতে বিয়ের বড়ো একটা খরচের জোগাড় হবে। তুমি বোধহয় জামাইকে চেনো। মোল্লাবাড়ির ছেলে। ভালো বেতনের চাকরি করে।

অবশেষে আর কী লিখব। শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ো। তোমার মায়ের বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। বকুল, রাজন ওরা ভালো আছে। পত্রপাঠ উত্তর দিয়ো।

ইতি

তোমার বাবা

লাল মিয়াঁ

বকুল সজীবের ছোটো বোন। দুই বছর আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। খুব ভালো রেজাল্ট। চারটা লেটার-সহ স্টার মার্কস। সজীব চিঠিতে খবরটা পেয়েছিল। বোনের জন্য কোনো উপহার কিনে নিয়ে যাবে সেই টাকাটাও তার কাছে ছিল না। হাসান একসেট রুপার নূপুর কিনে দিয়ে বলল, বলবি আমি জানতাম তুই এমন ভালো রেজাল্ট করবি। তাই এই নূপুরজোড়া

আগেই কিনে রেখেছিলাম। সজীব বোনকে নূপুরজোড়া হাতে দিয়ে ঠিক ঠিক শেখানো কথাই বলেছিল। বকুল নূপুর পেয়ে এত খুশি হয়েছিল যে, সাথে সাথে নূপুর পরে সারা উঠানে লাফালাফি। ও যে কী খুশি হয়েছিল। সজীব বকুলকে কলেজে ভর্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু সংসারের টানাটানি। মায়ের শরীর ভালো থাকে না। তারপরে কলেজ বেশ দূরে। তাই বোনটাকে আর পড়ানো হলো না। আর ওইটুকু মেয়ের বিয়ে। আগামী ফাল্গুন মাসে বিয়ে। সজীব এসব ভাবছিল আর হিসাব করছিল। ফাল্গুন মাস আসতে কয় মাস বাকি। এটা কী মাস চলছে?

হঠাৎ খেয়াল করল, কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়ছে। বুয়া রান্না করে চলে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। সজীব কয়েকবার জিজ্ঞাসা করল কে? কোনো উত্তর এলো না। দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেল সজীব। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তুপা। পরনে আকাশি রঙের শাড়ি। হাসিহাসি মুখ। যেন সদ্যফোটা গোলাপ ফুল। প্রথম যেদিন সজীব তুপাকে দেখেছে সেদিনও তুপা শাড়ি পরেছিল। আজ শাড়িতে আরও বেশি মানিয়েছে। সজীব হতভম্ব হয়ে বলল, 'আপনি?' সজীব একটু একটু কাঁপছে।

তুপা বলল, 'হুঁ' আমি।'

'বাসা চিনলেন কীভাবে?'

'হাসান ভাই ঠিকানা দিয়েছে। তা, ভেতরে আসতে বলবেন না?'

'ক্ষমা করবেন। একদম ভুলে গেছি, আসুন। ভেতরে আসুন।'

'সেই থেকে দেখছি আমায় আপনি আপনি করছেন। আমাকে দেখতে কী বুড়ি বুড়ি মনে হয়?'

'তা তো বলিনি, কিন্তু প্রথম প্রথম যুবতি মেয়েকে তুমি করে বলাটা ঠিক হবে না।'

তুপা সজীবের কথা শুনেই হি... হি... হি... করে হাসতে লাগল। সজীব তুপার দিকে তাকিয়ে হাসি দেখছে। তুপার হাসি তার ঠোঁটে অনেকক্ষণ লেগে থাকে। অপলক তাকিয়ে সজীব দেখছে তার হাসি। সজীব বলতে চাইল, তোমার হাসি খুব সুন্দর। কিন্তু বলতে পারল না, গলায় এসে আটকে গেল।

'তুমি দাঁড়িয়ে কেন বসো। না হলে আবার অভিযোগ করতে পারো বসতেও বলিনি।'

'এই তো সুন্দর।'

'মানে কী?'

'খুব তাড়াতাড়ি তুমিতে আসতে পেরেছেন।'

'ও তাইতো।' হি... হি... হি...

'আপনার হাসিটা খুব শুষ্ক শুষ্ক লাগছে। অসুখ করেনি তো?

'হুঁ' করেছে।

তুপা ব্যকুল কণ্ঠে বলল, 'কী হয়েছে?'

'জ্বর। তেমন কিছু না, সেরে যাবে।'

'আগে বলেননি কেন? কই দেখি দেখি। আপনার গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।'

তুপার হাতটা খুব ঠান্ডা। তুপার হাতের স্পর্শে সজীবের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সজীব মেসে এসে কতবার অসুস্থ হয়েছে— এমন আদরের স্পর্শ কখনো পায়নি।

'আচ্ছা, আপনি কেমন মানুষ বলেন তো? এতক্ষণ কেন বলেননি। কবে থেকে জ্বর? আর আমিও কতক্ষণ ধরে বকবক করছি।'

তুপার কণ্ঠ ভারি হয়ে এসেছে। এই বুঝি কান্না শুরু করবে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সামলাতে। একটা সুন্দর মেয়ে ভ্যাভ্যা করে কাঁদছে দেখতে কেমন দেখায়।

সজীব বলল 'তুমি কি এখন কেঁদে ফেলবে?'

'হুঁ, একেবারে সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলব।'

সজীব ভয় পেয়েছিল সত্যি বুঝি তুপা কাঁদতে শুরু করবে। এত সুন্দর একটা মেয়ে কাঁদলে খুব পচা লাগবে। সুবোধ বালিকার মতো সজীবের পাশে এসে বসল। কী যেন ভাবছে, তুপা।

'কিছু খেয়েছেন?'

'হুঁ নাস্তা করেছি, কিন্তু পেটে যায়নি। বমি করে ফেলেছি।' সজীব একটু হাসার চেষ্টা করল।

'চলুন আমার সঙ্গে।'

সজীব ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'কোথায়?'

'ডাক্তারের কাছে।'

'আরে এইটুকু জ্বরে কেউ ডাক্তারের কাছে যায় বুঝি?'

'যায় না?'

'না, যায় না। এখন বলো তুমি কী খাবে?'

'কিচ্ছু খাব না।'

'তা কী হয়। আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। তুমি বললে বানিয়ে খাওয়াতে পারি।'

তুপা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'কেন?' সজীব লক্ষ করল তুপার চোখ বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। এ যেন তার হাসির চেয়েও কম সুন্দর নয়।

হাসানের ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে ঘুম আসছে। তারপরও তার মন চাইছে না, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে। বাইরে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। আজকের আকাশে অনেক আলোময় চাঁদ। এই আলো তার নিজের না। ধার করা আলো। কিন্তু কী সুন্দর লাগছে রাতের আকাশ, চাঁদ আর জ্বলজ্বল করা তারাগুলোকে।

হাসান ছাদে উঠল। চারদিকে ইটের প্রাচীর। সারি সারি নানারকমের ফুলের গাছ। এককোনায় কবুতরের খোঁয়াড়। কবুতর পোষে ইমন। চাচা-ভাতিজা বয়সে প্রায় সমান। একবার বিকম পরীক্ষা ড্রপ দিয়ে আর পড়াশোনা করেনি। ইমনের চলাফেরা বেশ অন্যরকম। সব সময় অদ্ভুত রঙের পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায়। জিনসের প্যান্ট আর পায়ে চটি স্যান্ডেল। কিন্তু শখ করে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে শু কিনেছে। এখনো পরেনি। সব সময় ক্লিন শেভ করে থাকে। সারাক্ষণ মুখটা হাসিহাসি। তাকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীতে এত সুখী আর কেউ নেই। এর উলটা ব্যাখ্যাও আছে, অসুখীরাই নিজেকে সুখী সুখী ভাব করে রাখে।

হাসান দেখল কবুতরের খোঁয়াড়ের উলটোদিকে প্রাচীর ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইমন। আরেকজন যে তার একাকিত্বে ভাগ বসিয়েছে; সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই তার। হাসান ইমনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল চুপচাপ। এক ছাদের নিচে বসবাস। তবুও তাদের যোগাযোগটা কম হয়। তারপরও কোনোদিন দেখা হলে চাচা-ভাতিজার মন্দ সময় কাটে না। ইমনের কথাবার্তা হাসানের অদ্ভুত মনে হয়। সব কথাতেই ফাজলামো; আর রহস্য।

হাসান বলল, 'কেমন আছিস?'

ইমন যেভাবে হাসানের দিকে তাকাল মনে হয় যেন এইমাত্র তার খেয়াল হয়েছে— কেউ একজন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইমন বলল, 'ভালো আছি। কিরে কাকা, এত রাতে ছাদে?'

'জোছনা দেখব। দেখি তুই আমার আগেই এসে উপস্থিত।'

'ভালোই হলো। একলা কি জোছনা দেখা যায়? সবচেয়ে মজা হয় অরণ্যে গিয়ে মানে বনজঙ্গলে গিয়ে জোছনা দেখতে পারলে। ওই যে দেখ,

ফ্লাস্কভরতি চা নিয়ে এসেছি। সঙ্গে আরেকটা জিনিস আছে। গাঁজা। সিগেরেটে ভরে গাঁজা এনেছি।' ইমন একটু থামল। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল, 'শোন, এই গাঁজা নিয়ে দারুণ একটা গল্প আছে। একদিন মালিবাগ যাব। কিন্তু রিকশা পাচ্ছি না। কিছুটা হেঁটে সামনে গিয়ে দেখি, এক রিকশাওয়ালা সিটে বসে আয়েশ করে বিড়ি টানছে। আমি সামনে গিয়ে বললাম, মালিবাগ যাবে? রিকশাওয়ালা মাথা নেড়ে উত্তর দিলো যাবে না। তখন আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। নিজেকে সামলে বললাম, 'ভাই, কই যাবা?' এবার সে একটু রাগী গলায় বলল, যান তো ভাই বিরক্ত কইরেন না। হারাদিন পর যে একটু শান্তিতে গাঁজা টানুম তাও পারি না। যান তো যান।' ওর কথাটা আমার বেশ মনে ধরল। তৈরিপ্রণালি জানতে ইচ্ছে হলো। ফটাফট জেনেও নিলাম। কাকা এখানে যা আছে; এগুলো আমি নিজেই বানিয়েছি। কয়েকটা টেস্ট করেছি। মন্দ না। বিড়িতে ভরে টানতে পারলে ভালো হতো। ইমন কয়েক সেকেন্ড দম নিয়ে বলল, 'ছোটো কাকা শোন কীভাবে বানাতে হয়।'

হাসান চুপচাপ শুনল। কোনো কথা বলল না। সে এতটাই আশ্চর্য হয়েছে যে, তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ইমন আগের মতো বলতে লাগল, 'গাঁজা কিনতে পাওয়া যায়। এগুলো কেনাটাও কম ঝক্কির না। গাঁজা প্রথমে কেঁচি দিয়ে কুচিকুচি করে।' ইমনের কথা শেষ করতে দেয় না হাসান। জিজ্ঞাসা করে, 'কাকা, তোর মতো এমন সুখবাদী মানুষের হঠাৎ কী হয়েছে, বল আমাকে?'

ইমন এর কোনো উত্তর দিলো না। তারা দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইল। দুজনেই কথা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাসান, ইমন আর উজ্জ্বল চাঁদ হঠাৎ করে চুপচাপ, নিস্তব্ধ। হাসান এই নিগূঢ় স্তব্ধতা ভেঙে ডাক দিলো, 'ইমন?'

'হুঁ।'

'তোর কী হয়েছে? প্রেম-ভালোবাসার কোনো ব্যাপার?'

এবারও ইমন কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে রইল। অনেক সময় চুপ থাকাও উত্তর। হাসান ইমনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়েটা কে? তুই ভালোবাসিস জানে?'

'বলতে পারব না।'

'বলতে পারিস না, এর মানে কী? আমাকে সব খুলে বল। মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব।'

ইমন হাসানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। রাতের এই জোছনার আলোয় সেই চোখের পানি চিকচিক করছে।

হাসান তার দাদা ফিরোজ সাহেবকে ইমনের ব্যাপারে বোঝাতে পেরেছে। প্রথমে অমত করলেও তিনি মেনে নিয়েছেন। তিনি নিজে থেকেই মেয়ের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠালেন। মেয়েপক্ষ রাজি। ইমনকে এখন বেশ ফুরফুরে লাগছে। অকারণে বেশ কয়েকবার ইমন হাসানের ঘরে এসেছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন আলাপ করছে। ইনিয়েবিনিয়ে ইমন আসলে হাসানের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইছে। আজ খুব বেশি করে হাসানের তুপার কথা মনে পড়ছে। তারও একজন প্রিয় মানুষ আছে। যাকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তুপাকে অনেক ভালোবাসে; তুপা এ কথাটা জানে না। তুপার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে; ভেবেছে বলে দেবে তার ভালোবাসার কথা। বলতে পারেনি। যদি না করে দেয়— এই ভয়ে। তুপা খুব সেনসিটিভ মেয়ে। হঠাৎ এ কথা শুনে রাগ করে। এসব ভাবতে ভাবতে হাসানের গা শিউরে ওঠে।

এসব ভাবতে ভাবতে হাসান ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখছে। সুন্দর দিঘি। চারপাশে নারিকেল আর সুপারি গাছ। দিঘির স্বচ্ছ পানি টলটল করছে। নকশি করা বাঁধানো ঘাট। সেখানে একটি মেয়ে বসে আছে। পানিতে পা ভিজিয়ে আনন্দে নাড়ছে। মেয়েটা তুপা না। হাসান চিনতে চেষ্টা করছে, কে? কিছুতেই চিনতে পারছে না। হাসানকে ভাবতে দেখে মেয়েটি ফিক করে হেসে উঠল। হাসি থামছেই না। মেয়েটি বলল, 'আমি অদিতি। চিনতে পারছ না, হাসান ভাই?'

অদিতির কথা শুনে হাসানের লজ্জা লাগল। কী আশ্চর্য! সে অদিতিকে চিনছে না। সে লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না। পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল। অদিতি বলল, 'দেখো, কী সুন্দর পানি! ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।' এসো ছুঁয়ে দেখো— বলে আবদার করে হাসানের হাত ধরে দিঘির কাছে নিয়ে গেল। অদিতি দিঘির পাড়ে বসে পেছন ফিরে হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাছে আসো না, আমরা দুজনে একসঙ্গে পানি ছুঁয়ে দেখি। তুমি আর আমি পাশাপাশি। আসো।'

তারপর ঝপ করে একটা আওয়াজ হলো। অদিতি পানিতে পড়ে গেছে। অদিতি চিৎকার করছে। হাসান পানিতে লাফ দিলো। হাসানও ডুবে যাচ্ছে। সাঁতার দিতে পারছে না। হাসান ভালো সাঁতার জানে। অদিতির সঙ্গে হাসানও তলিয়ে যাচ্ছে। হাসান শুনতে পাচ্ছে, অদিতির ডাক, 'হাসান ভাই, হাসান ভাই।' দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে কে যেন হাসছে? খুব পরিচিত হাসি। তুপা, তুপার হাসি।

আমার জীবনে পরিচিত পুরুষমানুষ একজন হাসান। কিন্তু সে আমার বন্ধু। এর চেয়ে বেশি তো কখনো ভাবিনি। তাকে ভালোবাসিনি। তার জন্য আমার বুকের ভেতরটা এমন করে খচখচ করেনি। সজীবের জন্য কেন আমার এমন লাগছে? সজীবের সাথে পরিচয় আমার বেশিদিনের না। তারপরও আমার হাজার বছরের চেনা একজন মানুষ। আমি কি তাকে ভালোবাসি? নিজের মনকে প্রশ্ন করতেও ভয় হয়। আমি সজীবকে ভালোবাসি।

এমনটা কখনো ভাবিনি। আগে বান্ধবীদের দেখতাম। প্রেমিকের হাত ধরে চাইনিজে যায়। পার্কে ঘুরে বেড়ায়। তাদের আদিখ্যেতা দেখে আমার গা জ্বলত। ভাবতাম কী বেহায়া, বেহাল্লা মেয়েরে বাবা! আর এখন আমার কী হলো? এ কোন রোগে পেয়ে বসল। হঠাৎ করে আমি নিজেই এই রোগের রোগী। একজনকে মন দিয়ে বসেছি। ভালোবাসতে শুরু করেছি। সবার ক্ষেত্রেই কি এমনটা ঘটে? এমনি হয়। কোনোকিছুতেই মন বসে না। সারাক্ষণ লাগে কী যেন নেই, কী যেন নেই।

সজীবকে আমার কত্ত কথা বলার থাকে। কিচ্ছু বলা হয় না। সজীব কি আমার চোখের ভাষা বোঝে না? তাকে কত কথা বলব ভাবি, সামনে গেলেই আমার কথা জড়িয়ে আসে। গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। এখনো বলা হয়নি, সজীব তুমি শুধু আমারই। কী আশ্চর্য! যতক্ষণ আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি আমি বকবক করতেই থাকি। আর ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর হ্যাঁ, হুঁ করে। সবটাতেই ওর নীরব সম্মতি।

দিনদিন আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি। এখন আমার দিন কাটে অন্য একজনের ভাবনায়। সারাটারাতও কাটে তার ভাবনায়। যখন তার কথা ভাবতে থাকি আমি এক অন্যরকম হয়ে যাই। সেদিন গিয়াস স্যারের ক্লাসে কী লজ্জাটাই না পেলাম। স্যার কখন থেকে তুপা, তুপা, করে ডাকছে আমি শুনতেই পাইনি। যখন পলি গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, তুপা, স্যার তোকে ডাকছে। তখন সাড়া পেলাম। ফিরলাম বাস্তবে। দেখি ক্লাসসুদ্ধ সবাই

আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। স্যার কিছু না বললেও পলি ঠিক ঠিক আমাকে ডিটেনশনে নিল। পলি নাছোড়বান্দা, কার কথা ভাবছিলাম বলতেই হবে। আমি যে সজীবের কথা ভাবছি, পলিকে বলতে পারিনি। তার কথায় আমার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি একজনকে ভালোবাসি— এ কথা যদি পলিকে বলি। ও তো আকাশ থেকে পড়বে। অস্ফুটভাবে শুধু মুখ দিয়ে বের করবে অ্যাঁ, বলিস কী?

তুপা এসব ভাবছিল। হঠাৎ করে তার মা সুফিয়া বেগমের ডাকে তার ঘোর কেটে গেল। সে বাস্তবে ফিরে এলো। তুপার মা বেশ কয়েকটা ডাক দিলেও সে শুনতে পায়নি। সজীবের ভাবনায় ডুবে ছিল। যখন সজীবকে নিয়ে ভাবে তখন তার কানে কিচ্ছু যায় না। গিয়াস স্যারের ক্লাসেও কিছু শুনতে পায়নি। সেদিন তাদের কাজের মেয়েটা চা নিয়ে এসে কয়েকবার আফা, আফা করে ডাকল। কিন্তু তুপা শুনতে পেল না। যখন শুনল, তাকিয়ে দেখে আয়েশা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয় কাটিয়ে সাহস জোগাড় করে বলল, 'আফা আপনারে মনে হয় জিনে ধরেছে। আমগো গেরামে শেউলি ফুফুরেও জিনে ধরছিল। তারে কেউ ডাকলেও শুনতে পাইত না। তারেও আপনের মতো জিনে ধরছিল।' তুপা নিজে নিজে বিড়বিড় করল, কে জানে শিউলিকে কোন জিনে ধরেছিল। সেটা কী প্রেম জিন?

সুফিয়া বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুপা। তোমার বান্ধবী পলি এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে ড্রয়িংরুমে বসে আছে।' তুপা বুঝতে পারল তার মা রেগে গেছেন। রেগে গেলে সুফিয়া বেগম তুপাকে তুমি করে বলেন। রাগটা বাইরে প্রকাশ করেন না। তুমিটা হচ্ছে তার রেগে আগুন হওয়ার সংকেত।

তুপা আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, 'প্লিজ মা, পলিকে আমার রুমে পাঠিয়ে দাও।'

সুফিয়া বেগম হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তুপা আবার চিৎকার করে মাকে ডেকে বলল, 'আরেকটি কথা নাস্তা পাঠিয়ে দিয়ো। আর আমার জন্য এক কাপ রং চা।'

পলি, তুপা সহপাঠী ও বান্ধবী। তাদের বাড়ি কাছাকাছি। তাই প্রায়ই পলি এ বাড়িতে আসে। পলি মেয়েটি বেশ চঞ্চল। সব সময় হাসিখুশি থাকে। আর প্রেমের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। কিন্তু ছেলেদের একদম বিশ্বাস করে না। তার কাছে পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ বিশ্বাসঘাতক। তার এমন ধারণার কারণটা এখনো জানা যায়নি।

পলি বলল, 'তুপা কয়েকদিন হলো কলেজে যাচ্ছিস না। ব্যাপারটা কী?' তুপা তার মুখ চাপা দিয়ে কিছুটা রাগত স্বরে বলল, 'এই, একদম চুপ। বাসায় কেউ যেন না জানতে পারে, আমি কলেজে যাই না।'

পলি আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ও মা, এ কেমন কথা বাসায় কেউ বুঝি জানে না? তুই কলেজে যাস না।' তুপা পলির মুখের ভঙ্গিমায় ফিক করে হেসে ফেলল।

সুফিয়া বেগম নিজেই নাস্তা নিয়ে এলেন। পলির দিকে তাকিয়ে বললেন ' দেখো তো মা, তুপার কি শরীর খারাপ করেছে কি না? কেমন যেন থম ধরে থাকে। কিছু বলেও না। তুমি তোমার বান্ধবীকে একটু জিজ্ঞেস করো তো, ওর কী হয়েছে? তোমরা আজকালকার ছেলেপুলেরা যা হয়েছ। মা-বাবাকে জ্বালাতন করতে পারলেই বাঁচো। আমাদের টেনশন বোঝো না।'

পলি বলল, 'ঠিক আছে খালাম্মা, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি তুপার কী হয়েছে।'

'ঠিক আছে মা, তোমরা কথা বলো।'

সুফিয়া বেগম চলে যাওয়ার পর পলি তুপাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। পলি বলল, 'তোর কী হয়েছে বল তো? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস না তো? প্রেমে-ট্রেমে পড়িসনি তো দোস্ত?'

পলির মুখে এমন সত্য কথা শুনে তুপার স্বস্তি ফিরল। ভাবল পলিকে তার মনের কথাটা বলতে এখন খুব সহজ হবে। তুপা একটু মুচকি হেসে বলল, 'পলি আমি সত্যি সত্যি একজনের প্রেমে পড়েছি। আমি একজনকে ভালোবাসি।'

'সত্যি? আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'এই দেখ, তোকে ছুঁয়ে তিন সত্যি করছি। এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।'

' দোস্ত, রাজপুত্রটি কে?'

পলিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তুপা বলল, সজীবকে আমি খুব ভালোবাসি।'

'তুপা?'

'কী?'

'কিন্তু ছেলেরা যে বিশ্বাসঘাতক হয়।'

'কী করে বুঝলি?'

'আমিও যে একজনকে ভালোবেসে ঠকেছি।'

পলি কাঁদছে। তার চোখ বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তুপা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পলি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সবাই হয় না। কেউ কেউ বুঝি হয়।' বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সেই দীর্ঘশ্বাসে কষ্ট আছে।

'পলি তোর ভালোবাসার কথাটা বলবি?'

'বলব, অনেকদিন ধরেই বলতে চেয়েছিলাম। মেয়েরা যেমন তার কোনো প্রিয়জনকে অন্য একজনের সঙ্গে অহরহ মিলিয়ে দেখে। ছেলেরা কিন্তু এমনটা করে না। কিন্তু তারা সব সময় জীবনসঙ্গী হিসেবে সেরাটা চায়। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আমার ভাবির এক চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। আস্তে আস্তে সোহেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। দুজনে মিলে সিনেমা দেখতাম, পার্কে গিয়ে বাদাম খেতাম। আর মাঝে মাঝে চুমু খেতাম। একদিন আমাদের বাসায় মৌমিতা এলো। আমার স্কুলের বান্ধবী মৌমিতা। সেদিন সোহেল আমাদের বাসায়ই ছিল। আমি সোহেলের সঙ্গে মৌমিতাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মৌমিতা দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। মেয়েদের শরীরের রঙের চেয়ে শারীরিক গঠনটা বেশি আকৃষ্ট করে ছেলেদের। মৌমিতার শারীরিক গঠনটা দেখলে মেয়েদেরও হিংসা হয়। ওদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর সোহেল আমার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌লেও মৌমিতার সম্পর্কে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করত। ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা এসব আর কি। আমিও ফ্রিভাবেই সব ওকে বলতাম।'

পলির চোখ দিয়ে আবার পানি পড়ছে। পলি আপ্রাণ নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। পারছে না। তুপা তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছে না। পলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'সোহেল শেষে মৌমিতাকেই বিয়ে করে ফেলল।'

তুপা তাকিয়ে আছে পলির দিকে। এতদিন পরে নতুন এক পলিকে দেখছে। এ পলি কি সেই পলি। যাকে তুপা এতকাল দেখেছে।

'তুপা, তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো। আর আমাকে তোমায় দেখতে দাও। প্রাণভরে দেখতে দাও।'

সত্যি সত্যি তুপা সজীবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সজীব বলল, 'জানো তুপা, আমার বড়ো ভয় হয়। শেষ পর্যন্ত যদি তোমাকে না পাই।'

তুপা তার কোমল একটা হাত দিয়ে চেপে ধরল সজীবের মুখ। এমন একটা ভান করল যে কথাটা শুনে বেশ রাগ করেছে। তুপা বলল, 'এসব অলক্ষ্মী কথা যদি আর একবার বলো। তাহলে কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব।'

সজীব হাসতে হাসতে বলল, 'এজন্যই নারী নদীর মতো স্রেফ জল। তোমাদের নিংড়ালে কেবল পানিই বেরোবে। বুঝলে মেয়ে।' তুপা এ কথা শুনে হাসছে। সজীব মুগ্ধ হয়ে তার হাসি দেখছে। পৃথিবীর সুন্দর জিনিসগুলো দেখার জন্য অর্থব্যয় করতে হয় না। সজীবের মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেসব সুন্দর জিনিসের একটি হচ্ছে তুপার হাসি।

'তুপা?'

'বলো।'

'একটা গল্প বলছি শোনো।' তুপা বাচ্চা মেয়ের মতো বেশ আগ্রহ নিয়েই গল্পটা শুনছে। সজীব গল্প বলে যাচ্ছে, 'একদিন এক ফড়িংকে দেখে কেঁচো ভয় পেল। কেঁচো কাঁদছে আর কাঁদছে। ফড়িং বলল, এই কেঁচো কাঁদবি না। কাঁদলে কিন্তু গপ করে গিলে খাব। কেঁচো তবু কাঁদছে আর কাঁদছে। তাই, ফড়িং তাকে গপ করে গিলে খেলো। ব্যাংকে দেখে ফড়িং ভয় পেল। ফড়িং কাঁদছে আর কাঁদছে। ব্যাং বলল, এই ফড়িং কাঁদবি না। কাঁদলে কিন্তু গপ করে গিলে খাব। ফড়িং কাঁদছে আর কাঁদছে। তাই ব্যাং ফড়িংকে গপ করে গিলে খেলো। মাছরাঙাকে দেখে ব্যাং ভয় পেল। ব্যাং কাঁদছে আর কাঁদছে। মাছরাঙা বলল, এই ব্যাং কাঁদবি না। কাঁদলে কিন্তু গপ করে গিলে খাব। ব্যাং তবু কাঁদছে আর কাঁদছে। তাই মাছরাঙা ব্যাংকে গপ করে গিলে খেলো। শেয়ালকে দেখে মাছরাঙা ভয় পেল। মাছরাঙা কাঁদছে আর কাঁদছে। শেয়াল বলল, এই মাছরাঙা, কাঁদবি না। কাঁদলে কিন্তু

গপ করে গিলে খাব। মাছরাঙা তবু কাঁদছে আর কাঁদছে। তাই, শেয়াল মাছরাঙাকে গপ করে গিলে খেলো। সিংহকে দেখে শেয়াল ভয় পেল। শেয়াল কাঁদছে আর কাঁদছে। সিংহ বলল, এই শেয়াল কাঁদবি না। কাঁদলে কিন্তু গপ করে গিলে খাব। শেয়াল তবু কাঁদছে আর কাঁদছে। তাই, সিংহ তাকে গপ করে গিলে খেলো। এবার সিংহ এমনিতেই কাঁদছে। কাঁদছে তো কাঁদছেই। আ-আ-আ-আ-উ-উ-উ-উ। কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকি উঠল। তার তখুনি কান্নার হাঁয়ের সাথে বেরিয়ে এলো শেয়াল। শেয়ালের হাঁ থেকে বেরিয়ে এলো মাছরাঙা। মাছরাঙার হাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ব্যাং। ব্যাঙের হাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ফড়িং। ফড়িং হাঁ করতেই বেরিয়ে এলো কেঁচো। এবার সবার হাসার পালা।' তুপাও হাসবে। খিলখিল করে হাসছে। এটা তেমন কোনো হাসির গল্প না। তারপরও তুপা শিশুর মতো হাসছে। সজীব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে।

তুপা বলল, 'আচ্ছা, ওরা যদি ভয় না পেত তাহলে কি ওদের গপ করে গিলে খেতো না?' বলেই তুপা আবার হাসছে।

সজীব বলল, 'হয়তো খেতো।' সে একটু থেমে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে যদি আমি না পাই তাতে কোনো দুঃখ বা কারো প্রতি আমার কোনো অভিমান থাকবে না। ভালোবাসলে তাকে পেতেই হবে এমন কোনো শর্ত দিয়ে কখনো ভালোবাসা হয় না।'

সজীব একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু তা তুপার কাছে লুকালো না। আজ তার কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। কেনই বা সজীব এসব বলছে? এসবের কি কোনো কারণ আছে?

সজীব গুনগুন করে গাইছে— 'তোমার চুল বাঁধা দেখতে দেখতে ভাঙল কাচের আয়না।' তুপার বিশ্বাস হচ্ছে না সজীবের কণ্ঠ এত মিষ্টি। হাসান ভাইয়ের গানের গলাও সুন্দর। কিন্তু সে সব সময় একটি গানই গায়। তুপা খেয়াল করত মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে হাসান গাইছে, 'মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সনে।' যখন দেখত তুপা তাকে দেখছে তখনই গান বন্ধ করে দিত।

'তুপা?'

'হুঁ।'

'আজ আমি এমন একটা কিছু করব যা তোমার সব সময় মনে থাকবে। আর আমিও তোমার মাঝে বেঁচে থাকব। তুপা এই পৃথিবী থেকে এখনি যদি আমার মৃত্যু হয়। আমি সাথে সাথে আজরাইলকে আমার জীবন কবজ করতে বলব। আমি হাসতে হাসতে মৃত্যুকে মাথা পেতে নেব। কিন্তু

তোমার হৃদয়ে আমার মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি কেবল তোমার কাছেই চিরকাল অমর হয়ে থাকতে চাই। এ কি আমার খুব বেশি চাওয়া? তুপা তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

তুপা কিছু বলল না। সজীবের দিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সজীব বলল, 'আমি আজ যা করব তাতে তুমি বাধা দিতে পারো। এ অধিকার তোমার আছে। আমি তাতে কিছু মনে করব না।'

তুপা বুঝতে পারছে না, সজীব কী করতে চাইছে। কিন্তু সে যদি তুপার চোখের ভাষা পড়তে পারে তাহলে হয়তো সে একটি প্রশ্নবোধকচিহ্ন খুঁজে পাবে। তুপার চোখ বলছে, সজীব তুমি কী করবে? আমার যে খুব ভয় লাগছে।

'তুপা?'

'কী?'

'আমি তোমায় চুমু দেবো' বলেই— সজীব দুহাতে তুপাকে বুকের কাছে টেনে আনল— আলতো করে। তুপার চোয়াল তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। তুপা কোনো বাধা দিলো না। তার কুমারীত্বে প্রথম কারো ভালোবাসার পরশ খেলে গেল। তুপা কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে।

তুপার মা সুফিয়া বেগম হাসানদের বাসায় ফোন করেছিলেন। তুপার বাবা হালিম সাহেব তার সঙ্গে আলাপ করতে চান। সুফিয়া বেগমকে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেছে হাসান। কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেননি। যা বলার হালিম সাহেব নিজেই বলবেন। হাসান বিপদে পড়ে গেল। হঠাৎ করে কেন তাকে হালিম সাহেবের এত দরকার হলো। তাহলে কি তিনি দেখে ফেলেছেন হাসান প্রতিদিন বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানটায় বসে বসে তুপাকে দেখার চেষ্টা করে। দেখলে দেখতেও পারেন। অনেকদিন ধরেই তো হাসানের সন্দেহজনক গতিবিধি।

হালিম সাহেব রাশভারী মানুষ। হাসানের মনে হয় হালিম সাহেব সিংহ রাশির জাতক হবেন। তিনি শান্তভাবে কথা বললেও মনে হয় গজরাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি হাসানের সঙ্গে খুব একটা কথা বলেন না। দেখা হলে যদি হাসান সালাম দেয়। তাহলে তিনি মাথা নেড়ে জবাব দেন। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। এতেই হাসান বুঝে নেয় তিনি সালামের উত্তর নিয়েছেন। তারপর ভরিক্কি গলায় বলবেন, 'বাড়ির সবাই কেমন আছে? তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাসান গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। উঠে শেভ করল, গোসল করল। তারপর হলুদ রঙের কালো ছোপ ছোটো একটা শার্ট আর নরমাল প্যান্ট পরল। তার পছন্দের রং হলুদ। কিন্তু অনেকেই এই রংটাকে নিষিদ্ধ রং বলে। সব মানুষই হলুদ রং পছন্দ করে। সবাই সরিষার খেত দেখে আবেগে আপ্লুত হয়। খেতের আইলে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে। বিখ্যাত কারো ইন্টারভিউ নিলে তাকে বলা হয় বলুন তো আপনার প্রিয় রং কী? অন্য কোনো রঙের নাম বললেও হলুদ রঙের কথা বলবে না। কিন্তু হাসানের প্রিয় রংগুলোর একটি হলুদ। আর হলুদ হচ্ছে অপেক্ষার রং।

হাসান তুপাদের বাড়ি পৌঁছাল। তাদের বাড়ির মস্ত বড়ো গেটটায় কোনো দারোয়ান নেই। এটা হাসানের কাছে খুব বেমানান লাগে। এত

বিরাট প্রাসাদসম বাড়িতে দারোয়ান থাকবে না। এ কেমন কথা? হাসান কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলল তুপা। এটাও একটা অবাকের বিষয়। এ বাড়িতে সে যতবার এসেছে তুপা বাসায় থাকলে সে-ই দরজা খোলে। এসব বাড়ির দরজা খুলবে কাজের মেয়েরা। কলিংবেলের আওয়াজ হতেই গৃহকর্ত্রী গম্ভীর গলায় কাজের মেয়েকে বলবেন, 'এই সখিনা (এইটি পারসেন্ট কাজের মেয়ের নামই এরকম হয়) দরজা খুলে দেখ কে এলো?' কিন্তু এ বাড়িতেই সব উলটা-পালটা নিয়ম। কাজের মেয়ে আছে কিন্তু তার নাম কাজের মেয়ে টাইপ না। তার নাম গুলশানের মেম টাইপ।

তুপা আজও শাড়ি পরেছে। তুপা নিয়মিত শাড়ি পরতে শুরু করেছে? বড়ো হয়েছে এটা প্রমাণ করার জন্য মেয়েরা মায়ের শাড়ি গহনা পরে। শাড়ি পরে বাড়ির লোকজনদের চারপাশে ঘুরঘুর করে। যেন সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, 'আমি আর আগের মতো ছোট্টটি নেই। আমি বড়ো হয়ে গেছি। তাড়াতাড়ি আমাকে বিয়ে দাও। বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজো।' তুপাও কি এ কাজটি করছে। কী সর্বনাশ!

তুপাকে খুব খুশি খুশি লাগছে। তার মনের অস্পষ্ট খুশি ভাবটা চেহারায় ফুটে উঠেছে। হাসানকে দেখে তুপা তার মিষ্টি হাসিটা হাসল। তুপা বলল, 'হাসান ভাই আপনি যে আসবেন তা আমি জানতাম। দেখুন, আসবেন বলেই আমি শাড়ি পরেছি।'

হাসান বেশ অবাক হলো। সে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মুহূর্তেই তাকে অদৃশ্য এক ভালোলাগা জড়িয়ে ধরল। তুপাকে তার বলতে ইচ্ছে হলো, তোমায় আজ পরির মতো লাগছে। আমার তুপা পরি।

সুন্দরীদের সবটাতেই সুন্দর লাগে। কালো শাড়িতেও সুন্দর লাগে আবার অন্য রঙের শাড়িতেও সুন্দর লাগে। তুপা সাদা রঙের শাড়ি পরেছে। হাতে বাহারি রঙের কাচের চুড়ি। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। কিন্তু টিপ নেই। কপালে লাল টকটকে একটি টিপ থাকলে ভালো হতো। তাকে আরও সুন্দর লাগত। হাসান বলতে চাইল, তুপা তোমার লাল টিপ নেই। থাকলে এখনি কপালে দাও। না, আমি ঠিক ঠিক কপালে পরিয়ে দিই। দেরি কোরো না। জলদি একটি লাল টিপ নিয়ে আসো। কিন্তু হাসানের একটা 'দা গ্রেট' সমস্যা হলো অনেক কিছুই সে মুখ ফুটে বলতে পারে না।

হাসানকে চুপ থাকতে দেখে তুপা বলল, 'হাসান ভাই, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

হাসান বলল, 'বলো' কী বলবে?'

'তোমাকে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ভাবি তা কি তুমি জানো?'

হাসান মুখ ফুটে কোনো কথা বলল না। কিন্তু মনে মনে নিজেকে বলল, 'আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়ের রানির আসনে বসিয়েছি। সেই কবে— তা তো, তুমিও জানো না।'

'হাসান ভাই?'

হাসান তুপার কথায় চেতনা ফিরে পেয়ে আবার তার দিকে তাকল। তুপা বলল, 'আমি একজনকে খুব...' কথা শেষ করল না তুপা। বলল, 'আব্বু তোমার জন্য দোতলায় বসে আছে। তুমি ওপরে যাও। আমি পরে বলব।'

হাসান নানান সব বিষয়-আশায় ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। সেখানে তুপার বাবা-মা দুজনেই বসে আছেন। হাসানকে দেখতে পেয়ে তারা দুজনেই তার দিকে তাকালেন। তাদের সঙ্গে হাসানের কী কথা হলো তা জানি না। তবে হাসান যখন নিচে নেমে এলো তখন তুপা সামনে এসে বলল, 'আব্বু কী বলল?'

হাসানের মুখে কোনো হাসি নেই। তাকে যেন কোনো এক চরম কষ্ট গ্রাস করেছে। তুপার কথা তার কানে যায়নি। সে কোনো উত্তর না দিয়েই চলে এলো।

অনেকদিন হাসানের সঙ্গে দেখা নেই। শীতকালে সাপেরা যেমন গর্তে ঢুকে যায়। সেও তেমনি ঢুকে গেছে। লম্বা এক বিরতি নিয়ে সজীবের সঙ্গে মেসে গিয়ে দেখা করল। তাকে দেখে মনে হলো অনেকদিন ধরে সে ঘুমায় না। সারারাত জেগে থাকে। তার মুখে অনেকদিনের দাড়ি। হাসান সজীবকে বলল, 'তোর একটা চাকরির খুব দরকার তাই? তাছাড়া সামনে তোর বোনেরও বিয়ে।' একটা কাগজ সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। একটা বিদেশি এনজিও। কিন্তু তাদের অফিসটা ঢাকায় না। তোর গাইবান্ধায় যেতে হবে। তুই কালকেই গিয়ে জয়েন্ট কর। বেতন, সুযোগসুবিধা ভালো। পরে সুবিধামতো ঢাকায় বদলি হয়ে চলে আসতে পারবি।'

হাসানের কথাগুলো শুনে সজীব ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। চাকরি নামক আলাদীনের চেরাগ যে সে সত্যি সত্যিই পেয়েছে। হাসানেরই এই কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছে না। সে শুধু হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল। সজীব কিছুই বলতে পারল না। তার মুখ দিয়ে কিছু বের হলো না।

সজীব এই খুশির খবর তুপাকে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার তুপাদের বাড়িতে ফোন করল। কিন্তু একবারও তাকে পেল না। ফোন অন্য কেউ রিসিভ করছে। এরপর বেশ কয়েকবার ফোন করল কিন্তু রিং হচ্ছে না। ফোনে কোনো সমস্যা হয়েছে। টিঅ্যান্ডটি ফোনে তার চাকরির খবরটা তুপাকে আর দেওয়া হলো না। সে বলতে পারল না, তুপা আমি ভালো বেতনের একটা চাকরি পেয়েছি। এবার আমাদের সংসার হবে। আর মাত্র একটা বছর অপেক্ষা করো। একটুখানি সামলেই আমরা দুজন কবুল বলব। মিয়াঁ বিবি রাজি তো কী ক্যারেগা কাজি। হি... হি... হি...। তুপা ঠিক বলেছি না? সজীব সেদিনই চাকরিতে যোগ দিতে গাইবান্ধার উদ্দেশে রওনা করল।

তুপার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছাড়াই সজীব ঢাকা ছাড়ল। হাসানকেও বলা হয়নি তুপার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা। হাসানের

দেওয়া চাকরিটা তার জীবনকে স্থির করবে। বেকার জীবনে কিছুতেই সামলে উঠতে পারছিল না সজীব। একের পর এক ইন্টারভিউ দিতে দিতে সেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সজীব হিসাব করে দেখেছে বেতন খুব ভালো। বিদেশি এনজিও প্রতিবছর সুযোগসুবিধা বাড়াবে। আজকের আনন্দের দিনটাতে তুপাকে বলা হলো না।

সকালে ঘুম থেকে হাসানকে জাগানোর জন্য কয়েকবার তার ভাবি জোলেখা বেগম বৃথা চেষ্টা করলেন। তারপরও কিছুতেই ওঠাতে পারলেন না। রাতে হাসানের ঘুম আসছিল না। তারপর গোটা কয়েক ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিল। ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথেই ঘুম আসেনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঝাঁকিয়ে হাসানের চোখে ঘুম আসে। ফিরোজ সাহেব হাসানের সঙ্গে কথা বলার জন্য সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কাউকে কিছু বলছেন না। তাই বাধ্য হয়েই রেগে গিয়ে তার ভাবি শেষবারের মতো হাসানকে ডেকে তুলল। 'এই হাসান, ওঠ। ঐদিকে তোর দাদা খেপেছেন। তাড়াতাড়ি ওঠ বলছি। আঃ! কী মরার ঘুমই না ঘুমিয়েছে। তোর দাদা তোকে ডাকছে।'

হাসান তড়াক করে উঠে বসল। বেশ অপরিচিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল। ভাবির দিকে তাকাল। জোলেখা বেগমের মুখে আবার তার সেই কোমলতা ফিরে এসেছে। তার হঠাৎ করেই হাসানের প্রতি মমতা জেগে উঠল। তার মনে হলো এমনভাবে তো সে কখনোই হাসানকে দেখেনি। জোলেখা বেগমের মনে হচ্ছে হাসানের চেহারায় শিশু শিশু আদল রয়ে গেছে।

জোলেখা বেগম একটু স্নেহের সুরে বললেন, 'কিরে এত বেলা পর্যন্ত তো তুই কখনো ঘুমাস না। আজ তোর দাদা সেই ভোর থেকে উঠেই চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। হাসানকে ডাকো। হাসানকে ডাকো। শরীর ঠিক আছে তো তোর? শরীর খারাপ করেনি তো?'

হাসান চুপ করে রইল। তাই দেখে তিনি বললেন, 'তুই বরং হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

হাসান তাড়াতাড়ি করেই ফিরোজ সাহেবের কাছে গেল। তার মুখে অনেকদিনের জমে ওঠা দাড়িগুলো তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। হাসানকে দেখে ফিরোজ সাহেব মুখ তুলে তাকালেন। হাত ইশারায় চেয়ারে বসতে বললেন। ফিরোজ সাহেবের মুখ দেখে বোঝা গেল না। তার মনের অবস্থা কেমন। কিংবা কেন এত জরুরি ডাক। হাসান ভাবল, গুরুতর কিছু ঘটেছে।

ফিরোজ সাহেব বললেন, 'নাস্তা করেছিস?' তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'ও! তুই তো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলি। আমিও নাস্তা করিনি। যা তোর ভাবিকে বল দুজনের নাস্তা দিতে।'

হাসান উঠতে যাবে এ সময় রিনা নাস্তার ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। হাসানের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ট্রে রেখেই চলে গেল। নাস্তা করার সময় কেউ কোনো কথা বলল না। দুজনেই চুপচাপ রইল।

ফিরোজ সাহেব বললেন, 'কাল দোকানে গিয়েছিলি?'

'জি গিয়েছিলাম।'

'ম্যানেজারের গায়ে তুই হাত তুলেছিস?'

হাসান চুপ করে রইল। হাসানকে চুপ থাকতে দেখে ফিরোজ সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার চেহারা লাল হয়ে গেল। ফিরোজ সাহেব বললেন, 'কিরে কথা বলছিস না কেন?'

'হ্যাঁ।'

'ক্যাশ থেকে আশি হাজার টাকা এনেছিস?'

'জি।'

'এতগুলো টাকা দরকার পড়ল কেন?'

হাসান চুপ করে রইল। সে মাথা নিচু করে আছে। ফিরোজ সাহেব তার রাগ কিছুতেই চেপে রাখতে পারলেন না। শান্ত মানুষরা হঠাৎ রেগে গেলে যা হয়। তার রাগ বিপৎসীমা পার করেছে। ফিরোজ সাহেব রাগে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না। তুই ম্যানেজারকে মেরে ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে এসেছিস। এতগুলো টাকা কী করলি? এই চুপ করে থাকবি না।'

ফিরোজ সাহেবের রাগ ক্রমশ বাড়ছে। হাসান চারদিকে চোখ ফেরাল। বাঁচার জন্য যেন চারপাশে কাউকে খুঁজছে হাসান।

ফিরোজ সাহেব হঠাৎ করে বসা থেকে উঠে গিয়ে চিৎকার করতে করতে একনিঃশ্বাসে বলে গেলেন, 'আসলে মানুষ মিথ্যা বলে না। সৎভাই কখনো আপন হয় না। তুই তো আর আমার আপন ভাই না। সৎভাই। এতদিন দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি। আমার ভাই হলে কখনো এমন কাজ করতে পারত না।'

ফিরোজ সাহেবের চিৎকার শুনে জোলেখা বেগম রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। জোলেখা বেগম বললেন, 'আপনি কি পাগল হয়েছেন? এগুলো কীসব বলছেন? হাসান তুই ঘরে যা। তোর দাদার মাথা এখন ঠিক নেই।'

ফিরোজ সাহেব এক ঝাড়া দিয়ে জোলেখা বেগমকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোনো ছিনতাইকারী বদমাইশের জায়গা আমার বাড়িতে নেই। এতদিন

একটা কুত্তা পাললেও এর প্রতিদান দিত। শোনো, ওকে বলো, ও যেন এখনি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ওর মুখ আর আমি দেখতে চাই না।'

স্বামীর মুখে এ কথা শুনে জোলেখা বেগম যেন কথা হারিয়ে ফেলেছেন। সে কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। তার কী বলা উচিত। ফিরোজ সাহেবের নয়নের মণি হাসানকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছেন। তার কান এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

পাশের ঘর থেকে মনোয়ারা বেগম সব শুনেছেন। তার ছোটো ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি এক অর্থে নির্বিকারভাবেই ঘরে বসে আছেন। জোলেখা বেগম ফিরোজ সাহেবকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ক্রমশই তিনি আরও রেগে যাচ্ছেন। তার হার্টের সমস্যা আছে। হাসান তা জানে। যদি হাসান বাড়ি থেকে না বের হয়ে যায় তাহলে ফিরোজ সাহেব হার্ট অ্যাটাকও করতে পারেন। হাসান দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে। তার ভাবি পেছন থেকে ডাকছে, 'হাসান! হাসান! হাসান! ভাই আমার। লক্ষ্মী ভাই আমার শুনে যা।' হাসান পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। জোলেখা বেগম দৌড়ে তার শাশুড়ি মনোয়ারা বেগমের ঘরে ঢুকলেন। মনোয়ারা বেগম তন্দ্রা ভাঙার মতো মাথাটা উঠিয়ে তার চোখের দিকে তাকালেন।

জোলেখা বেগম বললেন, 'আম্মা, হাসান বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আপনাকে আল্লাহর দোহাই ওকে ফেরান। আপনার বড়ো ছেলে পাগল হয়ে গেছে। হাসানকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে।' এই বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

এর বাইরে বাড়িতে কেবল রিনা ছিল। সে এই ঘটনা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। ছোটো বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। একটু আগেও বাড়িটা একদম শান্ত ছিল। মনোয়ারা বেগমের কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। তার কান্নার বাঁধ যেন আর মানতে চাইছে না। যতটা সম্ভব নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন। তবুও অনেক কষ্টে কান্না জড়ানো কঠিন স্বরে বললেন, 'বউমা, হাসানকে ডেকো না। আমার হাসান মরে গেছে।'

এসবের মধ্যে অদিতি এসেছে। হাসান বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। হাসান অদিতির দিকে তাকাল। খুব কষ্টে মুখে একটু হাসি আনার বৃথা চেষ্টা করল মাত্র। তারপর বলল, 'ভালো থেকো।'

অদিতি চিৎকার করে ডাকল, 'হাসান ভাই। হাসান ভাই। একবার শোনো। একবার দাঁড়াও। হাসান ভাই। একবার দাঁড়াও হাসান ভাই।' হাসান আর ফিরে তাকাল না। অদিতি কাঁদছে। এই কান্না কোনোদিন হাসান দেখবে না।

শহরজুড়ে সোডিয়াম লাইটে আলোকিত। রাতের নির্জনতায় গ্রাস করে নিয়েছে ব্যস্ত ঢাকা। হালকা বাতাস বয়ে চলছে। মাঝে মাঝে শাঁ করে কোনো বাস কিংবা ট্রাক ছুটছে তাদের গন্তব্যে। সবার গন্তব্য আছে। কিন্তু হাসানের কোনো গন্তব্য নেই। সন্ধ্যা নামলে পাখিরা তাদের নীড়ে ফেরে। কিন্তু হাসান ঘরে ফেরে না। নতুন কোনো ঘর খুঁজে বেড়ায়।

সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। পাঠ্যবইয়ের নীতিকথা। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কোনোকিছুই কারো জন্য অপেক্ষা করে না। অপেক্ষা কেবল করে মানুষ। সজীবের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখেই আছে। হাসান ঘর ছাড়ার পর ফিরোজ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাজারো ওষুধে আর ডাক্তারে কোনো কাজ হয়নি। তিনি অকালেই মারা যান। ফিরোজ সাহেবের মৃত্যুর পর নানান কথা ওঠে। এত কিছুর পেছনে কেউবা দোষ দেয় ফিরোজ সাহেবের ওপর। কেউবা সব দোষ চাপাল হাসানের ওপর। আর এ কথাবার্তায় তার বাপ-দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠীর কেউ বাদ গেলেন না। তাদেরও পরপার থেকে টেনে আনা হলো।

তার মা মনোয়ারা বেগম এখন বড়ো মেয়ের বাসাতে থাকেন। বড়ো ছেলে ফিরোজের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি বাড়ি ছাড়েন। একদিন এ বাড়িতে ফিরোজ সাহেবের সঙ্গে এসেছিলেন। মনোয়ারা বেগম সব সময় বলতেন আমার দুই ছেলে বড়ো ছেলে ফিরোজ, ছোটো ছেলে হাসান। এখন বলেন, আমার এক ছেলে ফিরোজ। সে কিছুদিন হলো মারা গেছে। হাসানের জন্য ভালোবাসার দাবি নিয়ে কেউ অপেক্ষায় নেই। অদিতির বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর সে স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা চলে গেছে। সজীব চাকরি করছে গাইবান্ধা। হাসানকে সে কয়েকটা চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি। চিঠি তার কাছে ফেরত গেছে।

'হাসান, এখন কেমন আছিস?

'কে সজীব?'

'হুঁ।'

'আছি একরকম।'

'তোর বাসায় খবর দিয়েছি।'

'খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই। কেউ তো আর আসবে না। আমি তাদের কাছে মৃত। আপন বলতে কেউ নেই। ভেবেছিলাম তুপাকে পাব। তুপা ভালোবাসে তোকে। দেখ আমার কী ভাগ্য। কারো ভালোবাসাই পেলাম না।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে সজীবের দু-চোখ ভিজে এলো। মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে যে মানুষটি সে-ই হাসান কত আপদেবিপদে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। নিজের দুঃখকষ্টের কথা কখনো বলেনি। যখন জানতে পারে তুপা আর সজীব একে অপরকে ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসায় যাতে কোনো বাধা না আসে সেজন্য সজীবের চাকরির ব্যবস্থা করে। কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বলেনি তার ভালোবাসার কথাটা। বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালনের হকটুকু কি শুধু হাসানের? সজীবের কি কোনো দায়িত্ব নেই? সজীব ঠিক করল যে করেই হোক তুপাকে নিয়ে আসবেই। অন্তত এই শেষ সময় সে হাসানের পাশে থাকবে।

সজীব?

যাতে সজীবের কান্না ধরা না পড়ে সেজন্য সজীব আস্তে করে বলল, 'বল আমি শুনছি।'

'কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম— দাদা ভাত মেখে আমায় খাইয়ে দিচ্ছে। দেখ কী লজ্জার ব্যাপার। এত বড়ো ছেলেকে কেউ এভাবে খাইয়ে দেয়?' আমি বললাম, 'দাদা, পেট ভরে গেছে।' দাদা বললেন, 'এই নে এটা হচ্ছে কবুতরের ডিম, এইটা চড়ুইয়ের ডিম। এভাবে মুখে পুরে দিতে লাগলেন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল।'

কথা শেষ করেই দাদারে! দাদারে! বলে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল হাসান। সজীব এ কান্না থামানোর জন্য কোনো সান্ত্বনা দিতে পারল না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে লক্ষ করল তার চোখ ভিজে গেছে। সজীব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একজন সুন্দরী ডাক্তার এসে বলল, 'এখানে কী হয়েছে? রোগীকে ডিস্টার্ব করছেন কেন? এমনিতে তার শরীর খুব দুর্বল।'

ডাক্তারের শাসানিতে হাসানের কান্না থামল। সজীব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এরপর হাসাপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো। হাসান বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর। কোথায় ছিল? কী হলো? বাঁচল কী মরল? এ খবর কেউ রাখেনি। আর রাখার কেউ চেষ্টাও করেনি। কিন্তু আজকের দুরবস্থা থেকে এটুকু অনুমান করা যায় ও নেশা করত। বোধহয় সব ধরনের নেশাই সে করেছে। প্যাথিড্রিনের সুচের হাজারো ছিদ্র হাসানের হাতে। সব নাটকের মতো করে ঘটে গেছে অনেক কিছু।

সজীব ঢাকায় আসে। হাসানের বাড়িতে যায়। কিন্তু কেউ তার ব্যাপারে কিছু বলতে চায় না। ফিরে আসার সময় রিনা তাকে হাসানের বাড়ি ছাড়ার কথা বলে। আরও বলে, ফিরোজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে হোসেন ব্যাপারী নামে একজন এসে দশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। তারপরই ফিরোজ সাহেবের শরীর খারাপ হতে থাকে। মৃত্যুর আগে তিনি কেবল বলতেন হাসান কোনো দোষ করেনি। আমি হাসানকে বাড়ি থেকে বের করে ভুল করেছি। আমি বড়ো ভুল করেছি।

কীভাবে হাসানের খোঁজ সজীব পায় তা জানি না। সজীব হাসানকে খুঁজে বের করার পর মাদকদ্রব্য সেবন নিরাময় হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসান প্রথম কিছুদিন অচেতন ছিল।

সজীব হাসপাতাল থেকে সরাসরি তুপাদের বাড়িতে যাবে ঠিক করেছে। কোনো রিকশা পাচ্ছে না। তুপাদের ওখানে কেউ যেতে চাইছে না। তাই বাধ্য হয়েই এই গরমে হাঁটছে। সজীবের কত স্মৃতিই আজ মনে পড়ছে। প্রথম ঢাকায় আসার স্মৃতি। হাসানের সঙ্গে বন্ধুত্বের গল্প। হঠাৎ একদিন তুপার সেই মেসে এসে চমকে দেওয়ার দিনের কথা। সব মনে পড়ছে।

তুপাদের বাড়ির সামনে গিয়ে সজীব আঁতকে উঠল। বিয়ে বাড়ির মতো করে সাজানো। বাড়িতে নতুন দারোয়ান। তার কাছে সজীব শুনতে পেল এই বাড়ির মেয়ের বিয়ে। মানে তুপার আজ বিয়ে।

সজীব তুপাকে ভালোবাসত। তুপাও ভালোবাসত। আর ভালোবাসার কথাটা উভয়েই অকপটে একজন আরেকজনকে বলেছিল। তারপর কী যে

হলো? সজীব চাকরি পেয়ে চলে গেল গাইবান্ধা। সেখানে সে তুপার দুইটা চিঠিও পেয়েছিল। খুব বড়ো না, ছোটো ছোটো চিঠি। দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিল, এ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঢাকায় আমাদের বাসায় এসে দেখা করবে। তা না হলে একটা অঘটন ঘটে যাবে। সজীব আসতে পারেনি। নতুন চাকরি। তার ওপর নতুন জায়গায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে সজীব। তারপর বেশ কয়েকটি চিঠি তুপাকে দিয়েও কোনো উত্তর পায়নি। ঢাকায় এসে শুনতে পায় হাসানের কথা। বিভিন্ন কারণে ঢাকায় এসেও তুপার সঙ্গে তার আর দেখা করা হয়নি।

তুপা সজীবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। বাবা-মাকে তাদের বিয়ের ব্যাপারে রাজি করে। তুপার বাবা হালিম সাহেব বলেছিলেন, 'যদি তোমার চিঠি পেয়ে সজীব আসে— আমরা তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করব। তুমি আমার একমাত্র মেয়ে। তোমার সুখই আমার সুখ।'

চিঠি পাওয়ার পরও সজীব আসেনি। তুপা তার বাবাকে বলল, 'তোমাদের যেখানে ইচ্ছা আমার বিয়ে দিতে পারো; আমার কোনো আপত্তি নেই।'

হালিম সাহেব তার মেয়ের মুখে এ কথা শুনে বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েকে কোনো প্রশ্ন করেননি।

আজ তুপার বিয়ে। পাত্র যোগ্যই বটে। ঢাকার পয়সাওয়ালা ফ্যামিলির ছেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেছে। একটি বিদেশি ফার্মে চাকরি করছে। কোম্পানি থেকে দম্পতিযুগলকে ঢাকা টু সিঙ্গাপুর যাওয়ার টিকিট দিয়েছে।

সজীব রাস্তা দিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে শুরু করল। সকাল থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি। রাস্তায় বমি করতে লাগল। তার এ অবস্থা দেখে কিছু উৎসুক দর্শক আশেপাশে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কেউ মন্তব্য করল, 'শালায় মনে হয় কিছু খাইছে। ডাইল-টাইল হইব। তা না হইলে কি কেউ বমি কইরা রাস্তা ভাসায়া দেয়।' কেউবা একপলক দেখে মুখ ফিরিয়ে হাঁটা শুরু করল। সজীব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ লাল। একটু একটু ক্ষুধাও লাগতে শুরু করেছে। মুখে কেমন যেন টকটক স্বাদ।

হাসান চোখ মেলল। ঘরটা তার কাছে আধো আলো আধো অন্ধকার লাগছে। মনে হচ্ছে তার মাথার ভেতর বসে কেউ খটখট শব্দ করে সুপারি কাটছে। তার দাদা কি পান খেতো? হাসানের মনে পড়ছে না। সাবধানে সে মাথা কাত করল। তার মনে হচ্ছে কে যেন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাসান ডাকল, 'দাদা?'

হাসান দেখল, তার দাদা আসন করে বসে আছে। সে চমকে উঠে বলল, 'দাদা আপনি কোত্থেকে এলেন?'

'কাল্লু তোর এ কী অবস্থা হয়েছে? তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ দাদা, অনেক কষ্ট হচ্ছে।' সত্য কথাটা যেন হাসানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সত্যটা সে বলতে চায়নি।

ফিরোজ সাহেব বললেন, 'তোর খুব দুঃখ ছিল, তাই না?' হাসান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কোনো উত্তর দিলো না। তিনি আবার বললেন, 'টাকাটা তুই কেন নিয়েছিলি আমি জানি রে।'

হাসান তার দাদাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক দাদা সেসব কথা।'

'তুই কি কাউকে ভালোবাসতি?'

এবার হাসান লজ্জা পেল। কীভাবে বলবে হ্যাঁ আমি তুপাকে ভালোবাসি। হাসান বলতে পারল না।

'সেসব কথা থাক। শোন আমি তোকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় যাব?'

'আমি যেখানে থাকি।'

'আপনি কোথায় থাকেন? দাদা আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

'পানি খাবি?

'হুঁ।'

হাসান আর পানি খেতে পারেনি তার আগেই মারা যায়। যখন মারা যায় তখন পানি দেওয়ার মতো কোনো আপনজন তার পাশে ছিল না। কোনো ভালোবাসার চোখ তার প্রতি তাকিয়ে দুফোঁটা চোখের পানি ফেলেনি। হাসপাতালের বিছানায় লম্বালম্বি সাদা ময়লা একটা চাদরে হাসানের শরীর

আপাদমস্তক ঢাকা। সে এখন মৃত। সে এ পৃথিবী থেকে চলে গেছে। তার এখন কোনো ঠিকানার প্রয়োজন নেই। কোনো ঘর খুঁজে বেড়াবারও দরকার নেই।

'আব্বু। আব্বু।'

'কে হাসান?'

'হুঁ।'

'ডাকছ কেন বাবা?'

'আম্মু তোমাকে খেতে ডাকছে। তুমি তো এখনো কিছু খাওনি।'

'তোমার আম্মুকে গিয়ে বলো, আব্বু এখনি আসছে।'

হাসান আমার ছেলে। এক হাসান মারা গেছে। আর সেদিনই আরেকজন এ পৃথিবীতে এসেছে আমার ছেলে হয়ে। এতদিনে সজীব কেমন আছে? কিংবা তুপার কী হয়েছে? এ সংবাদ আমার জানা নেই। আজ আমি এক হাসানের কথা লিখলাম। একদিন অন্য কেউ হয়তো আবার হাসানের কথা লিখবে। সেটা হয়তো সুখের হবে। সেখানে হাসান ভালোবাসা পাবে। তুপাকে পাবে।